প্রবন্ধ

সমাজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচিপত্র

- আচারের অত্যাচার 2
- সমুদ্রযাত্রা 10
- বিলাসের ফাঁস 18
- কোট বা চাপকান 26
- নকলের নাকাল 34
- প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 43
- অযোগ্য ভক্তি 58
- পূর্ব ও পশ্চিম 70

আচারের অত্যাচার

" ইংরেজিতে পাউণ্ড আছে, শিলিং আছে, পেনি আছে, ফার্দিং আছে–আমাদের টাকা আছে, আনা আছে, কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দন্তি আছে, কাক আছে, তিল আছে। . . . ইংরেজ এবং অন্যান্য জাতি ক্ষুদ্রতম অংশ ধরে না, ছাড়িয়া দেয় ; আমরা ক্ষুদ্রতম অংশ ধরি, ছাড়ি না . . . হিন্দু বলেন যে ধর্মজগতেও কড়াক্রান্তিটি বাদ যায় না, স্বয়ং ভগবান কড়াক্রান্তিটিও ছাড়েন না। তাই বুঝি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তি পর্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। "

– সাহিত্য, ৩য় ভাগ, ৭ম সংখ্যা

সকল দিক সমানভাবে রক্ষা করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্য মানুষকে কোনো - না - কোনো বিষয়ে রফা করিয়া চলিতেই হয়।

কেবলমাত্র যদি থিয়োরি লইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তুমি কড়া, ক্রান্তি, দন্তি, কাক, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ লইয়া, ঘরে বসিয়া, পাটিগণিতের বিচিত্র সমস্যা পূরণ করিতে পার। কিন্তু কাজে নামিলেই অতিসূক্ষ্ম অংশগুলি ছাঁটিয়া চলিতে হয়, নতুবা হিসাব মিলাইতে মিলাইতে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় না।

কারণ, সীমা তো এক জায়গায় টানিতেই হইবে। তুমি সূক্ষ্মহিসাবী, দন্তি কাক পর্যন্ত হিসাব চালাইতে চাও, তোমার চেয়ে সূক্ষতর হিসাবী বলিতে পারেন, কাকে গিয়াই বা থামিব কেন। বিধাতার দৃষ্টি যখন অনন্ত সূক্ষ্ম, তখন আমাদের জীবনের হিসাবও অনন্ত সূক্ষ্মের দিকে টানিতে হইবে। নহিলে তাঁহার সম্পূর্ণ সন্তোষ হইবে না - তিনি ক্ষমা করিবেন না।

বিশুদ্ধ তর্কের হিসাবে ইহার বিরুদ্ধে কাহারো কথা কহিবার জো নাই– কিন্তু কাজের হিসাবে দেখিতে গেলে, জোড়হস্তে বিনীতস্বরে আমরা বলি, " প্রভু, আমাদের অনন্ত ক্ষমতা নাই, সে তুমি জান। আমাদিগকে কাজও

করিতে হয় এবং তোমার কাছে হিসাবও দিতে হয়। আমাদের জীবনের সময়ও অল্প এবং সংসারের পথও কঠিন। তুমি আমাদিগকে দেহ দিয়াছ, মন দিয়াছ, আত্মা দিয়াছ ; ক্ষুধা দিয়াছ, বুদ্ধি দিয়াছ, প্রেম দিয়াছ ; এবং এই - সমস্ত বোঝা লইয়া আমাদিগকে সংসারের সহস্র লোকের সহস্র বিষয়ের আবর্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছ। ইহার উপরেও পণ্ডিতেরা ভয় দেখাইতেছেন, তুমি হিন্দুর দেবতা অতি কঠিন, তুমি কড়াক্রান্তি দন্তিকাকের হিসাবও ছাড় না। তা যদি হয়, তবে তো হিন্দুকে সংসারের কোনো প্রকৃত কাজে, মানবের কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অবসর দেওয়া হয় না। তবে তো তোমার বৃহৎ কাজ ফাঁকি দিয়া, কেবল তোমার ক্ষুদ্র হিসাব কষিতে হয়। তুমি যে শোভাসৌন্দর্যবৈচিত্র্যময় সাগরাম্বরা পৃথিবীতে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছ, সে - পৃথিবী তো পর্যটন করিয়া দেখা হয় না, তুমি যে উন্নত মানববংশে আমাদিগকে জন্মদান করিয়াছ, সেই মানবদের সহিত সম্যক্ পরিচয় এবং তাহাদের দুঃখমোচন, তাহাদের উন্নতিসাধনের জন্য বিচিত্র কর্মানুষ্ঠান, সে তো অসাধ্য হয়। কেবল ক্ষুদ্র পরিবারে ক্ষুদ্র গ্রামে বদ্ধ হইয়া, গৃহকোণে বসিয়া, গতিশীল বিপুল মানবপ্রবাহ ও জগৎসংসারের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া আপনার ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের কড়াক্রান্তি গণিতে হয়। ইহাকে স্পর্শ করিব না, তাহার ছায়া মাড়াইব না, অমুকের অন্ন খাইব না, অমুকের কন্যা গ্রহণ করিব না, এমন করিয়া উঠিব, অমন করিয়া বসিব, তেমন করিয়া চলিব, তিথি নক্ষত্র দিন ক্ষণ লগ্ন বিচার করিয়া হাত পা নাড়িব, এমন করিয়া কর্মহীন ক্ষুদ্র জীবনটাতে টুকরা টুকরা করিয়া কাহনকে কড়াকড়িতে ভাঙিয়া স্তূপাকার করিয়া তুলিব, এই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। হিন্দুর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবলমাত্র ‘ হিঁদু' হইব , মানুষ হইব না। ”

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, “ পেনি ওয়াইজ পাউণ্ড ফুলিশ”– বাংলায় তাহার তর্জমা করা যাইতে পারে, “ কড়ায় কড়া কাহনে কানা। ” অর্থাৎ কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিল

দেওয়া। তাহার ফল হয়, “ বজ্র আঁটন ফসকা গিরো”–প্রাণপণ আঁটুনির ত্রুটি নাই কিন্তু গ্রন্থিটি শিথিল।

আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধিব্যবস্থা - আচরণবিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া, মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।

সামাজিক আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মনীতির ধ্রুব অনুশাসনগুলি পর্যন্ত সকলেরই প্রতি সমান কড়াক্কড় করাতে ফল হইয়াছে, আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে কিন্তু ধর্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। একজন লোক গোরু মারিলে সমাজের নিকট নির্যাতন সহ্য করিবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিবে, কিন্তু মানুষ খুন করিয়া সমাজের মধ্যে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্থান পাইয়াছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পাছে হিন্দুর বিধাতার হিসাবে কড়াক্রান্তির গরমিল হয়, এইজন্য পিতা অষ্টমবর্ষের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দেন এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে জাতিচ্যুত হন ; বিধাতার হিসাব মিলাইবার জন্য সমাজের যদি এতই সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকে তবে উক্ত পিতা নিজের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের শত শত পরিচয় দিলেও কেন সমাজের মধ্যে আত্মগৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ইহাকে কি কাকদন্তির হিসাব বলে। আমি যদি অস্পৃশ্য নীচজাতিকে স্পর্শ করি, তবে সমাজ তৎক্ষণাৎ সেই দন্তিহিসাব সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচজাতির ভিটামাটি উচ্ছিন্ন করিয়া দিই, তবে সমাজ কি আমার নিকট হইতে সেই কাহনের হিসাব তলব করেন। প্রতিদিন রাগদ্বেষ লোভমোহ মিথ্যাচরণে ধর্মনীতির ভিত্তিমূল জীর্ণ করিতেছি, অথচ স্নান তপ বিধিব্যবস্থার তিলমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। এমন কি দেখা যায় না।

আমি বলি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে ধর্মনীতিমূলক পাপকে পাপ বলে না। কিন্তু মনুষ্যকৃত সামান্য সামাজিক নিষেধগুলিকেও তাহার সমশ্রেণীতে ভুক্ত করাতে যথার্থ পাপের ঘৃণ্যতা স্বভাবতই হ্রাস হইয়া আসে। অত্যন্ত বৃহৎ ভিড়ের ভিতর শ্রেণীবিচার দুরূহ হইয়া উঠে। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা এবং

সমুদ্রযাত্রা হইতে নরহত্যা পর্যন্ত সকল পাপই আমাদের দেশে গোলে হরিবল দিয়া মিশিয়া পড়ে।

পাপখণ্ডনেরও তেমনই শত শত সহজ পথ আছে। আমাদের পাপের বোঝা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, তেমনই যেখানে - সেখানে তাহা ফেলিয়া দিবারও স্থান আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম, অমনি গাত্রের ধুলা এবং ছোটোবড়ো সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। যেমন রাজ্যে বৃহৎ মড়ক হইলে প্রত্যেক মৃতদেহের জন্য ভিন্ন গোর দেওয়া অসাধ্য হয়, এবং আমীর হইতে ফকির পর্যন্ত সকলকে রাশীকৃত করিয়া এক বৃহৎ গর্তের মধ্যে ফেলিয়া সংক্ষেপে অন্ত্যেষ্টিসৎকার সারিতে হয়, আমাদের দেশে তেমনই খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে এত পাপ যে, প্রত্যেক পাপের স্বতন্ত্র খণ্ডন করিতে গেলে সময়ে কুলায় না ; তাই মাঝে মাঝে একেবারে ছোটোবড়ো সকলগুলাকে কুড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এক সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে হয়। যেমন বজ্র আঁটন তেমন ফসকা গিরো।

এইরূপ পাপপুণ্য যে মনের ধর্ম, মানুষ ক্রমে ক্রমে সেটা ভুলিয়া যায়। মন্ত্র পড়িলে, ডুব মারিলে, গোময় খাইলে যে পাপ নষ্ট হইতে পারে এ বিশ্বাস মনে আনিতে হয়। কারণ, মানুষকে যদি মানুষের হিসাবে না দেখিয়া যন্ত্রের হিসাবে দেখ, তবে তাহারও নিজেকে যন্ত্র বলিয়া ভ্রম হইবে। যদি সামান্য লাভলোকসান ব্যাবসাবাণিজ্যিক ছাড়া আর কোনো বিষয়েই তাহার স্বাধীন বুদ্ধিচালনার অবসর না দেওয়া হয়, যদি ওঠাবসা মেলামেশা ছোঁওয়াখাওয়াও তাহার জন্য দৃঢ়নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে মানুষের মধ্যে যে একটা স্বাধীন মানসিক ধর্ম আছে সেটা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে হয়। পাপপুণ্য সকলই যন্ত্রের ধর্ম, মনে করা অসম্ভব হয় না এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও যন্ত্রসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অতিসূক্ষ্ম যুক্তি বলে, যদি মানুষের স্বাধীন বুদ্ধির প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র নির্ভর করা যায় তবে দৈবাৎ কাকদন্তির হিসাব না মিলিতে পারে। কারণ, মানুষ ঠেকিয়া শেখে—কিন্তু তিলমাত্র ঠেকিলেই যখন পাপ, তখন তাহাকে শিখিতে অবসর না দিয়া নাকে দড়ি দিয়া চালানোই যুক্তিসংগত। ছেলেকে হাঁটিতে শিখাইতে গেলে পড়িতে দিতে হয়, তাহা অপেক্ষা তাহাকে বুড়াবয়স

www.bengaliebook.com

পর্যন্ত কোলে করিয়া লইয়া বেড়ানোই ভালো। তাহা হইলে তাহার পড়া হইল না, অথচ গতিবিধিও বন্ধ হইল না। ধূলির লেশমাত্র লাগিলে হিন্দুর দেবতার নিকট হিসাব দিতে হইবে, অতএব মনুষ্যজীবনকে তেলের মধ্যে ফেলিয়া শিশির মধ্যে নীতি - মিউজিয়ামের প্রদর্শনদ্রব্যের স্বরূপ রাখিয়া দেওয়াই সুপরামর্শ।

ইহাকেই বলে কড়ার কড়া, কাহনে কানা। কী রাখিলাম আর কী হারাইলাম সে কেহ বিচার করিয়া দেখে না। কবিকঙ্কণে বাণিজ্যবিনিময়ে আছে -

শুকুতার বদলে মুকুতা দিবে
ভেড়ার বদলে ঘোড়া।

আমরা পণ্ডিতেরা মিলিয়া অনেক যুক্তি করিয়া শুক্তার বদলে মুক্তা দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। মানসিক যে স্বাধীনতা না থাকিলে পাপপুণ্যের কোনো অর্থই থাকে না, সেই স্বাধীনতাকে বলি দিয়া নামমাত্র পুণ্যকে তহবিলে জমা করিয়াছি।

পাপপুণ্য - উত্থানপতনের মধ্য দিয়া আমাদের মনুষ্যত্ত্ব উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। স্বাধীনভাবে আমরা যাহা লাভ করি সে - ই আমাদের যথার্থ লাভ ; অবিচারে অন্যের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করি তাহা আমরা পাই না। ধূলিকর্দমের উপর দিয়া, আঘাতসংঘাতের মধ্য দিয়া, পতনপরাভব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে যে - বল সঞ্চার করি, সেই বলই আমাদের চিরসঙ্গী। মাটিতে পদার্পণমাত্র না করিয়া, দুগ্ধফেনশুভ্র শয়ান থাকিয়া হিন্দুর দেবতার নিকটে জীবনের একটি অতিনিষ্কলঙ্ক হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়–কিন্তু সে - হিসাব কী। একটি শূন্য শুভ্র খাতা। তাহাতে কলঙ্ক নাই এবং অঙ্কপাত নাই। পাছে কড়াক্রান্তি - কাকদন্তির গোল হয় এইজন্য আয় ব্যয় স্থিতিমাত্র নাই।

নিখুঁত সম্পূর্ণতা মনুষ্যের জন্য নহে। কারণ, সম্পূর্ণতার মধ্যে একটা সমাপ্তি আছে। মানুষ ইহজীবনের মধ্যেই সমাপ্ত নহে। যাঁহারা পরলোক মানেন না, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন, একটি জীবনের মধ্যেই মানুষের উন্নতিসম্ভাবনার শেষ নাই।

নিম্নশ্রেণীর জন্তুরা ভূমিষ্ঠকাল অবধি মানবশিশুর অপেক্ষা অধিকতর পরিণত। মানবশিশু একান্ত অসহায়। ছাগশিশুকে চলিবার আগে পড়িতে হয় না। যদি বিধাতার নিকট চলার হিসাব দিতে হয়, তবে ছাগশাবক কাকদন্তির হিসাব পর্যন্ত মিলাইয়া দিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের পতন কে গণনা করিবে।

জন্তুদের জীবনের পরিসর সংকীর্ণ, তাহারা অল্পদূর গিয়াই উন্নতি শেষ করে—এইজন্য আরম্ভকাল হইতেই তাহারা শক্তসমর্থ। মানুষের জীবনের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ, এইজন্য বহুকাল পর্যন্ত সে অপরিণত দুর্বল।

জন্তুরা যে - স্বাভাবিক নৈপুণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে ইংরেজিতে তাহাকে বলে ইন্‌স্‌টিংক্‌ট্‌, বাংলায় তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সহজ - সংস্কার। সহজ - সংস্কার, অশিক্ষিতপটুত্ব একেবারেই ঠিক পথ দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি ইতস্তত করিতে করিতে ভ্রমের মধ্য দিয়া আপনার পথ সন্ধান করিয়া বাহির করে। সহজ - সংস্কার পশুদের, বুদ্ধি মানুষের। সহজ - সংস্কারের গম্যস্থান সামান্য সীমার মধ্যে, বুদ্ধির শেষ লক্ষ্য এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

আবশ্যকের আকর্ষণ চতুষ্পার্শ্ব বাঁচাইয়া, পথঘাট দেখিয়া, ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করিয়া, সুবিধার পথ দিয়া আমাদিগকে স্বার্থপরতার সীমা পর্যন্ত লইয়া যায় ; প্রেমের আকর্ষণ আমাদিগকে সমস্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া, আত্মবিসর্জন করাইয়া, কখনো ভূতলশায়ী কখনো অশ্রুসাগরে নিমগ্ন করে। আবশ্যকের সীমা আপনার মধ্যে, প্রেমের সীমা কোথায় কেহ জানে না। তেমনই, পূর্ব র্ব হইতে সমস্ত নির্দিষ্ট করিয়া, সমস্ত পতন সমস্ত গ্লানি হইতে রক্ষা করিয়া একটি নিরতিশয় সমতল সমাজের মধ্যে নিরাপদে জীবন চালনা করিলে, সে - জীবনের পরিসর নিতান্ত সামান্য হয়।

আমরা মানবসন্তান বলিয়াই বহুকাল আমাদের শারীরিক মানসিক দুর্বলতা ; বহুকাল আমরা পড়ি, বহুকাল আমরা ভুলি, বহুকাল আমাদিগের শিক্ষা করিতে যায়—আমরা অনন্তের সন্তান বলিয়া বহুকাল ধরিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্বলতা, পদে পদে আমাদের দুঃখ কষ্ট পতন। কিন্তু সে - ই আমাদের সৌভাগ্য, সে - ই আমাদের চিরজীবনের

লক্ষণ, তাহাতেই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, এখনো আমাদের বুদ্ধি ও বিকাশের শেষ হইয়া যায় নাই।

শৈশবেই যদি মানুষের উপসংহার হইত, তাহা হইলে মানুষের অপরিস্ফুটতা সমস্ত প্রাণীসংসারে কোথাও পাওয়া যাইত না ; অপরিণত পদস্খলিত ইহজীবনেই যদি আমাদের পরিসমাপ্তি হয়, তবে আমরা একান্ত দুর্বল ও হীন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বিলম্ববিকাশ, আমাদের ত্রুটি, আমাদের পাপ আমাদের সম্মুখবর্তী সুদূর ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। বলিয়া দিতেছে, কড়াক্রান্তি কাকদন্তি চোখবাঁধা ঘানির বলদের জন্য ; সে তাহার পূর্ববর্তীদের পদচিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র সুগোলচক্রের মধ্যে প্রতিদিন পাক খাইয়া সর্ষপ হইতে তৈলনিষ্পেষণ - নামক একটি বিশেষনির্দিষ্ট কাজ করিয়া জীবননির্বাহ করিতেছে, তাহার প্রতি মুহূর্ত এবং প্রতি তৈলবিন্দু হিসাবের মধ্যে আনা যায়–কিন্তু যাহাকে আপনার সমস্ত মনুষ্যত্ব অপরিমেয় বিকাশের দিকে লইয়া যাইতে হইবে, তাহাকে বিস্তর খুচরা হিসাব ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে।

উপসংহারে একটি কথা বলিয়া রাখি, একিলিস এবং কচ্ছপ নামক একটি ন্যায়ের কুতর্ক আছে। তদ্দ্বারা প্রমাণ হয় যে, একিলিস যতই দ্রুতগামী হউক, মন্দগতি কচ্ছপ যদি একত্রে চলিবার সময় কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর থাকে, তবে একিলিস তাহাকে ধরিতে পারিবে না। এই কুতর্কে তার্কিক অসীম ভগ্নাংশের হিসাব ধরিয়াছেন–কড়াক্রান্তি - দন্তিকাকের দ্বারা তিনি ঘরে বসিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যেন কচ্ছপ চিরদিন অগ্রবর্তী থাকিবে। কিন্তু এ দিকে প্রকৃত কর্মভূমিতে একিলিস এক পদক্ষেপে সমস্ত কড়াক্রান্তি - দন্তিকাক লঙ্ঘন করিয়া কচ্ছপকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়। তেমনই আমাদের পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন যে, কড়াক্রান্তি - দন্তিকাক লইয়া আমাদের কচ্ছপসমাজ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অগ্রসর হইয়া আছে ; কিন্তু দ্রুতগামী মানবপথিকেরা এক - এক দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের সমস্ত সূক্ষ্ম প্রমাণ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইতেছে ; তাহাদিগকে যদি ধরিতে চাই তবে চুল চেরা হিসাব ফেলিয়া দিয়া রীতিমত চলিতে আরম্ভ করা যাক। আর তা যদি না চাই, তবে অন্ধ আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিবার

জন্য চোখ বুজিয়া পাণ্ডিত্য করা অলস সময়যাপনের একটা উপায় বটে। তাহাতে আমাদের পুণ্য প্রমাণ হয় কি না জানি না, কিন্তু নৈপুণ্য প্রমাণ হয়।

সমুদ্রযাত্রা

বাংলাদেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র-আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্র এবং চটি পুঁথি বাক্যোচ্ছ্বাসে ফেনিল ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, পরস্পর আঘাত প্রতিঘাতেরও শেষ নাই।

তর্কটা এই লইয়া যে, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসিদ্ধ না শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ তাহা লইয়া কোনো

কথা নহে। কারণ, যাহা অন্য হিসাবে ভালো অথবা যাহাতে কোনো মন্দর সংস্রব দেখা যায় না, তাহা যে

শাস্ত্রমতে ভালো না হইতে পারে, এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের কোনো লজ্জা নাই।

যাহাতে আমাদের মঙ্গল, আমাদের শাস্ত্রের বিধানও তাহাই, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তাহা যদি পারিতাম, তবে সেই মঙ্গলের দিক হইতে যুক্তি আকর্ষণ করিয়া শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দিতাম। আগে দেখাইতাম, অমুক কার্য আমাদের পক্ষে ভালো এবং অবশেষে দেখাইতাম তাহাতে আমাদের শাস্ত্রের সম্মতি আছে।

সমুদ্রযাত্রার উপকারিতার পক্ষে ভুরি ভুরি প্রমাণ থাক্ - না কেন, যদি শাস্ত্রে তাহার বিরুদ্ধে একটিমাত্র বচন থাকে, তবে সমস্ত প্রমাণ ব্যর্থ হইবে। তাহার অর্থ এই, আমাদের কাছে সত্যের অপেক্ষা বচন বড়ো, মানবের শাস্ত্রে নিকট জগদীশ্বরের শাস্ত্র ব্যর্থ।

শাস্ত্রই যে সকল সময়ে বলবান তাহাও নহে। অনেকে বলেন বটে, ঋষিদের এমন অমানুষিক বুদ্ধি ছিল যে, তাঁহারা যে - সকল বিধান দিয়াছেন, সমস্ত প্রমাণ তুচ্ছ করিয়া আমরা অন্ধবিশ্বাসের সহিত নির্ভয়ে তাহা পালন করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু সমাজে অনেক সময়েই শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য তাঁহারা লঙ্ঘন করেন এবং লোকাচার ও দেশাচারের দোহাই দিয়া থাকেন।

তাহাতে এই প্রমাণ হয় যে শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য অভ্রান্ত নহে। যদি অভ্রান্ত হইত, তবে লোকাচার তাহার কোনোরূপ অন্যথা করিলে লোকাচারকে দোষী করা উচিত হইত। কিন্তু দেশাচার ও লোকাচারের প্রতি যদি শাস্ত্রবিধি সংশোধনের ভার দেওয়া যায়, তবে শাস্ত্রের অমোঘতা আর থাকে না ; তবে স্পষ্ট মানিতে হয়, শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।

তাহা যদি না খাটিল, তবে আমাদের কর্তব্যের নিয়ামক কে। শুভবুদ্ধিও নহে, শাস্ত্রবাক্যও নহে। লোকাচার। কিন্তু লোকাচারকে কে পথ দেখাইবে। লোকাচার যে অভ্রান্ত নহে, ইতিহাসে তাহার শতসহস্র প্রমাণ আছে। লোকাচার যদি অভ্রান্ত হইত, তবে পৃথিবীতে এত বিপ্লব ঘটিত না, এত সংস্কারকের অভ্যুদয় হইত না।

বিশেষত যে - লোকসমাজের মধ্যে জীবনপ্রবাহ নাই, সেখানকার জড় লোকাচার আপনাকে আপনি সংশোধন করিতে পারে না। স্রোতের জল অবিশ্রান্ত গতিবেগে নিজের দূষিত অংশ ক্রমাগত পরিহার করিতে থাকে। কিন্তু বদ্ধ জলে দোষ প্রবেশ করিলে তাহা সংশোধিত হইতে পারে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমাদের সমাজ বদ্ধ সমাজ। একে তো আভ্যন্তরিক সহস্র আইনে বদ্ধ, তাহার পরে আবার ইংরেজদের আইনেও বাহির হইতে আষ্টেপৃষ্টে বন্ধন পড়িয়া গেছে। সমাজসংশোধনে স্বদেশীয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার ছিল এবং পূর্বকালে তাঁহারা সে - কাজ করিতেন। কিন্তু অনধিকারী ইংরেজ আমাদের সমাজকে যে - অবস্থায় হাতে পাইয়াছে, ঠিক সেই অবস্থায় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সে নিজেও কোনো নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে সাহস করে না, বাহির হইতেও কোনো নূতন নিয়মকে প্রবেশ করিতে দেয় না। কোন্‌টা বৈধ কোন্‌টা অবৈধ তাহা সে অন্ধভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন সমাজের কোনো সচেতন স্বাভাবিক শক্তি সহজে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না।

এমন বাঁধা - সমাজের মধ্যে যদি লোকাচার মানিতে হয়, তবে একটা মৃত দেবতার পূজা করিতে হয়। সে কেবল একটা নিশ্চল নিশ্চেষ্ট

www.bengaliebook.com

জড় কঙ্কাল। সে চিন্তা করে না, অনুভব করে না, সময়ের পরিবর্তন উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার দক্ষিণে বামে নড়িবার শক্তি নাই। সমস্ত হতভাগ্য জাতি, তাহার সমস্ত ভক্ত উপাসক, যদি তাহার সম্মুখে পড়িয়া পলে পলে আপনার মরণব্রত উদ্‌যাপন করে, তথাপি সে কল্যাণপথে তিলার্ধমাত্র অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে পারে না।

যাঁহারা শাস্ত্র হইতে বিধি সংগ্রহ করিয়া লোকাচারকে আঘাত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা কী করেন। তাঁহারা মৃতকে মারিতে চাহেন। যাহার বেদনাবোধ নাই তাহার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করেন, যে অন্ধ তাহার নিকট দীপশিখা আনয়ন করেন। অস্ত্র প্রতিহত হয়, দীপশিখা বৃথা আলোকদান করে।

তাঁহাদের আর - একটা কথা জানা উচিত। শাস্ত্রও এক সময়ের লোকাচার। তাঁহারা অন্য সময়ের লোকাচারকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া বর্তমানকালের লোকাচারকে আক্রমণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন, বহুপ্রাচীনকালে সমুদ্রযাত্রার কোনো বাধা ছিল না। বর্তমান লোকাচার বলে, তখন ছিল না এখন আছে ; ইহার কোনো উত্তর নাই।

এ যেন এক শত্রুকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে আর - এক শত্রুকে ডাকা। মোগলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাঠানের হাতে আত্মসমর্পণ করা। যাহার নিজের কিছুমাত্র শক্তি আছে, সে এমন বিপদের খেলা খেলিতে চাহে না।

আমাদের কি নিজের কোনো শক্তি নাই। আমাদের সমাজে যদি কোনো দোষের সঞ্চার হয়, যদি তাহার কোনো ব্যবস্থা আমাদের সমস্ত জাতির উন্নতিপথের ব্যাঘাতস্বরূপ আপন পাষাণমস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে, তবে তাহা দূর করিতে গেলে কি আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, বহু প্রাচীনকালে তাহার কোনো নিষেধবিধি ছিল কি না। যদি দৈবাৎ পাওয়া গেল, তবে দিনকতক পণ্ডিতে পণ্ডিতে শাস্ত্রে শাস্ত্রে দেশব্যাপী একটা লাঠালাঠি পড়িয়া গেল ; আর যদি দৈবাৎ অনুস্বারবিসর্গবিশিষ্ট একটা বচনার্ধ না পাওয়া গেল, তবে আমরা কি এমনি নিরুপায় যে, সমাজের সমস্ত

অসম্পূর্ণতা সমস্ত দোষ শিরোধার্য করিয়া বহন করিব, এমন - কি তাহাকে পবিত্র বলিয়া পূজা করিব। দোষও কি প্রাচীন হইলে পূজ্য হয়।

আমরা কি নিজের কর্তব্যবুদ্ধির বলে মাথা তুলিয়া বলিতে পারি না– পূর্বে কী ছিল এবং এখন কী আছে তাহা জানিতে চাহি না, সমাজের যাহা দোষ তাহা দূর করিব, যাহা মঙ্গল তাহা আবাহন করিয়া আনিব। আমাদের শুভাশুভ জ্ঞানকে হস্তপদ ছেদন করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়া দিব, আর একটা গুরুতর আবশ্যক পড়িলে, দেশের একটা মহৎ অনিষ্ট একটা বৃদ্ধ অকল্যাণ দূর করিতে হইলে, সমস্ত পুরাণসংহিতা আগমনিগম হইতে বচনখণ্ড খুঁজিয়া খুঁজিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইতে হইবে–সমাজের হিতাহিত লইয়া বয়স্ক লোকের মধ্যে এরূপ বাল্যখেলা আর কোনো দেশে প্রচলিত আছে কি।

আমাদের ধর্মবুদ্ধিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যে - লোকাচারকে তাহার স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছি, সে আবার এমনি মূঢ় অন্ধ যে, সে নিজের নিয়মেরও সংগতি রক্ষা করিতে জানে না। কত হিন্দু যবনের জাহাজে চড়িয়া উড়িষ্যা মাদ্রাজ সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জাতি লইয়া কোনো কথা উঠিতেছে না, এ দিকে সমুদ্রযাত্রা বিধিসংগত নহে বলিয়া লোকসমাজ চীৎকার করিয়া মরিতেছে। দেশে শত শত লোক অখাদ্য ও যবনান্ন খাইয়া মানুষ হইয়া উঠিল, প্রকাশ্যে যবনের প্রস্তুত মদ্য পান করিতেছে, কেহ সে দিকে একবার তাকায়ও না, কিন্তু বিলাতে গিয়া পাছে অনাচার ঘটে এজন্য বড়ো শঙ্কিত। কিন্তু যুক্তি নিষ্ফল। যাহার চক্ষু আছে তাহার নিকট এ - সকল কথা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবারও আবশ্যক ছিল না। কিন্তু লোকাচার নামক প্রকাণ্ড জড়পুত্তলিকার মস্তকের অভ্যন্তরে তো মস্তিষ্ক নাই, সে একটা নিশ্চল পাষাণমাত্র। কাককে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত গৃহস্থ হাঁড়ি চিত্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে খাড়া করিয়া রাখে, লোকাচার সেইরূপ চিত্রিত বিভীষিকা। যে তাহার জড়ত্ব জানে সে তাহাকে ঘৃণা করে, যে তাহাকে ভয় করে তাহার কর্তব্যবুদ্ধি লোপ পায়।

আজকাল অনেক পুস্তক ও পত্রে আমাদের বর্তমান লোকাচারের অসংগতিদোষ দেখানো হয়। বলা হয়, এক দিকে আমরা বাধ্য হইয়া

www.bengaliebook.com

অথবা অন্ধ হইয়া কত অনাচার করি, অন্য দিকে সামান্য আচার বিচার লইয়া কত কড়াক্কড়। কিন্তু হাসি পায় যখন ভাবিয়া দেখি, কাহাকে সে - কথাগুলো বলা হইতেছে। শিশুরা পুত্তলিকার সঙ্গেও এমনি করিয়া কথা কয়। কে বলে লোকাচার যুক্তি অথবা শাস্ত্র মানিয়া চলে। সে নিজেও এমন মহা অপরাধ স্বীকার করে না। তবে তাহাকে যুক্তির কথা কেন বলি।

সমাজের মধ্যে যে - কোনো পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিনা যুক্তিতেই সাধিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ, চৈতন্য যখন এই জাতিনিগড়বদ্ধ দেশে জাতিভেদ কথঞ্চিৎ শিথিল করেন, তখন তাহা যুক্তিবলে করেন নাই, চরিত্রবলে করিয়াছিলেন।

আমাদের যদি এরূপ মত হয় যে, সমুদ্রযাত্রায় উপকার আছে ; মনুর যে - নিষেধ বিনা কারণে ভারতবর্ষীয়দিগকে চিরকালের জন্য কেবল পৃথিবীর একাংশেই বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে, সেই কারাদণ্ডবিধান নিতান্ত অন্যায় ও অনিষ্টজনক, দেশে - বিদেশে গিয়া জ্ঞান - অর্জন ও উন্নতিসাধন হইতে কোনো প্রাচীন বিধি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না ; যিনি আমাদিগকে এই সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণের অধিকার দিয়াছেন–তবে আমরা আর কিছু শুনিতে চাহি না–তবে কোনো শ্লোকখণ্ড আমাদিগকে ভয় দেখাইতে, কোনো লোকাচার আমাদিগকে নিষেধ করিতে পারে না।

বাঁধও ভাঙিয়াছে। কেহ শাস্ত্র ও লোকাচারের মুখ চাহিয়া বসিয়া নাই। বঙ্গগৃহ হইতে সন্তানগণ দলে দলে সমুদ্রপার হইতেছে, এবং ক্ষীণবল সমাজ তাহার কোনো প্রতিবিধান করিতে পারিতেছে না। সমাজের প্রধান বল নীতিবল যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে বেশিদিন কেহ ভয় করিবে না। যে - সমাজ মিথ্যাকে কপটতাকে মার্জনা করে, অর্ধগুপ্ত অনাচারের প্রতি জানিয়া - শুনিয়া চক্ষু নিমীলন করে, যাহার নিয়মের মধ্যে কোনো নৈতিক কারণ কোনো যৌক্তিক সংগতি নাই, সে যে নিতান্ত দুর্বল। সমাজের সমস্ত বিশ্বাস যদি দৃঢ় হইত, যদি সেই অখণ্ড বিশ্বাস অনুসারে সে নিজের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়মিত করিত, তবে তাহাকে লঙ্ঘন করা বড়ো দুরূহ হইত।

www.bengaliebook.com

যাঁহারা শুভবুদ্ধির প্রতি নির্ভর না করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে চান, তাঁহারা দুর্বল। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে কোনো যুক্তি নাই ; সমাজ শাস্ত্রমতে চলে না।

দ্বিতীয় কথা এই, লোকাচার যে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে তাহার একটা অর্থ আছে। হিন্দুসমাজের অনেকগুলি নিয়ম পরস্পর দৃঢ়সম্বন্ধ। একটা ভাঙিতে গেলে আর - একটা ভাঙিয়া পড়ে। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিতে হয়। বাল্যবিবাহ গেলে ক্রমশই স্বাধীনবিবাহ আসিয়া পড়ে। স্বাধীনবিবাহ প্রচলিত করিতে গেলে সমাজের বিস্তর রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং জাতিভেদের মূল ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসে। কিন্তু তাই বলিয়া এখন স্ত্রীশিক্ষা কে বন্ধ করিতে পারে।

সমুদ্র পার হইয়া বিদেশযাত্রাও আমাদের বর্তমান সমাজ রক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। আমাদের সমাজে কোনো অবসর নাই। আমরা নিশ্চেষ্ট নিশ্চল অন্ধভাবে সমাজের অন্ধকূপে এক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব, লোকাচারের এই বিধান। মৃত্যুর ন্যায় শান্ত অবস্থা আর নাই, সেই অগাধ শান্তি লাভ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব আমাদের জীবনীশক্তি লোপ করা হইয়াছে। একটি সমগ্র বৃহৎ জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নির্জীব করিয়া ফেলিতে অল্প আয়োজন করিতে হয় নাই। কারণ মনুষ্যত্বের অভ্যন্তরে একটি অমর জীবনের বীজ নিহিত আছে যে, সে যদি কোনো ছিদ্র দিয়া একটুখানি স্বাধীন সূর্যালোক ও বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়, অমনি অঙ্কুরিত পল্লবিত বিকশিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। সেই ভয়ে আমাদের হিন্দুসমাজ কোথাও কোনো ছিদ্র রাখিতে চাহে না। আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম পাষাণ ইষ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথিয়া তুলিয়া একটি দেশব্যাপী অপূর্ব প্রকাণ্ড কারাপুরী নির্মাণ করা হইয়াছে। যেখানেই কালক্রমে একটি ইষ্টক খসিয়া পড়িতেছে, একটি ছিদ্র আবিষ্কৃত হইতেছে, সেইখানেই পুনর্বার নূতন মৃত্তিকালেপ ও নূতন ইষ্টকপাত করিতে হইতেছে। আমাদের সমাজ জীবন্ত নহে, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্তন নাই, তাহা সুসম্বন্ধ, পরিপাটি প্রকাণ্ড জড় অট্টালিকা। তাহার প্রত্যেক কক্ষ পরিমিত, তাহার প্রত্যেক ইষ্টক যথাস্থানে বিন্যস্ত।

স্বাধীনতাই এ সমাজের সর্বপ্রধান শত্রু। যে রৌদ্র বৃষ্টি বায়ুতে জীবিত পদার্থের জীবনধারণ হয়, সেই রৌদ্র বৃষ্টি বায়ুতেই ইহার ইষ্টক জীর্ণ করে, এইজন্য সমাজশিল্পী অদ্ভুত নৈপুণ্যসহকারে এই কারাগারের মধ্যে সমস্ত স্বাধীন স্বাভাবিক শক্তির প্রবেশ প্রতিরোধ করিয়াছে।

যে যেখানে আছে, সে ঠিক সেইখানেই থাকিলে তবে এই জড়সমাজ রক্ষিত হয়। তিলমাত্র নড়িলে - চড়িলে সমস্তটাই সশব্দে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, এইজন্য যেখানেই জীবনচাঞ্চল্য লক্ষিত হয়, সেখানেই তৎক্ষণাৎ চাপ দিতে হয়।

সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশে নূতন সভ্যতার নূতন নূতন আদর্শ লাভ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে চিন্তার বন্ধনমুক্তি হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে - সমস্ত নিয়ম আমরা বিনা সংশয়ে আজন্মকাল পালন করিয়া আসিয়াছি, কখনো কারণ জিজ্ঞাসাও মনে উদয় হয় নাই, সে - সম্বন্ধে নানা যুক্তি তর্ক ও সন্দেহের উদ্ভব হইবে। সেই মানসিক আন্দোলনই হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ। বাহ্যত ম্লেচ্ছা সংসর্গ ও সমুদ্র পার হওয়া কিছুই নহে, কিন্তু সেই অন্তরের মধ্যে স্বাধীন মনুষ্যত্বের সঞ্চার হওয়া যথার্থ লোকাচারবিরুদ্ধ।

কিন্তু হায়, আমরা সমুদ্র পার না হইলেও মনুর সংহিতা অন্য জাতিকে সমুদ্র পার হইতে নিষেধ করিতে পারেন নাই। নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ, নূতন বিশ্বাস জাহাজ - বোঝাই হইয়া এ দেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আমাদের যে গোড়াতেই ভ্রম। সমাজরক্ষার জন্য যদি আমাদের এত ভয়, এত ভাবনা, তবে গোড়ায় ইংরেজি - শিক্ষা হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত ছিল। পর্বতকে যদি মহম্মদের নিকট যাইতে নিষেধ কর, মহম্মদ যে পর্বতের কাছে আসে, তাহার উপায় কী। আমরা যেন ইংলণ্ডে না গেলাম, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা যে আমাদের গৃহে গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। বাঁধটা সে - ই তো ভাঙিয়াছে। আজ যে এত বাকচাতুরী, এত শাস্ত্রসন্ধানের ধূম পড়িয়াছে, মূলে আঘাত না পড়িলে তো তাহার কোনো আবশ্যক ছিল না।

কিন্তু মূঢ় লোকাচার এমনি অন্ধ অথবা এমনি কপটাচারী যে, সে দিকে কোনো দৃক্‌পাত নাই। অতি - বড়ো পবিত্র হিন্দুও শৈশব হইতে আপন পুত্রকে ইংরেজি শিখাইতেছে ; এমন - কি, মাতৃভাষা শিখাইতেছে না ; এবং শিক্ষাসমিতি - সভায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাশিক্ষার প্রস্তাব উঠিতেছে, তখন স্বদেশের লোকেই তো তাহাতে প্রধান আপত্তি করিতেছে।

কেরানীগিরি না করিলে যে উদরপূর্ণ হয় না। পাস করিতেই হইবে। পাস না করিলে চাকরি চুলায় যাক, বিবাহ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। ইংরেজি - শিক্ষার মর্যাদা দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে এমনি বদ্ধমূল হইয়াছে।

কিন্তু এ কী ভ্রম, এ কী দুরাশা। ইংরেজি - শিক্ষাতে কেবলমাত্র যতটুকু কেরানীগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকিটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশলাভ করিবে না। এ কি কখনো সম্ভব হয়। দীপশিখা কেবল যে আলো দেয় তাহা নহে ; পলিতাটুকুও পোড়ায়, তেলটুকুও শেষ করে। ইংরেজি - শিক্ষা কেবল যে মোটা মোটা চাকরি দেয় তাহা নহে, আমাদের লোকাচারের আবহমান সূত্রগুলিকেও পলে পলে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

এখন যতদিন এই শিক্ষা চলিবে এবং ইহার উপর আমাদের জীবিকানির্বাহ নির্ভর করিবে, ততদিন যিনি যেমন তর্ক করুন, শাস্ত্র মৃতভাষায় যতই নিষেধ ও বিভীষিকা প্রচার করুক, বাঙালি সমুদ্র পার হইবে, পৃথিবীর সমস্ত উন্নতিপথের যাত্রীদের সঙ্গ ধরিয়া একত্রে যাত্রা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।

বিলাসের ফাঁস

ইংরেজ আত্মপরিতৃপ্তির জন্য পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি খরচ করিতেছে, ইহা লইয়া ইংরেজি কাগজে আলোচনা দেখা যাইতেছে। এ কথা তাহাদের অনেকেই বলিতেছে যে, বেতনের ও মজুরির হার আজকাল উচ্চতর হইলেও তাহাদের জীবনযাত্রা এখনকার দিনে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি দুরূহ হইয়াছে। কেবল যে তাহাদের ভোগস্পৃহা বাড়িয়াছে তাহা নহে, আড়ম্বরপ্রিয়তাও অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেবলমাত্র ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষের অধিক লোক দেনা শোধ করিতে না পারায় আদালতে হাজির হয়। এই - সকল দেনার অধিকাংশই আড়ম্বরের ফল। পূর্বে অল্প আয়ের লোক সাজে সজ্জায় যত বেশি খরচ করিত, এখন তাহার চেয়ে অনেক বেশি করে। বিশেষত মেয়েদের পোশাকের দেনা শোধ করিতে গৃহস্থ ফতুর হইতেছে। যে - স্ত্রীলোক মুদির দোকানে কাজ করে, ছুটির দিনে তাহার কাপড় দেখিয়া তাহাকে আমীর - ঘরের মেয়ে বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, এমন ঘটনা দুর্লভ নহে। বৃহৎ ভূসম্পত্তি হইতে যে - সকল ড্যুকের বিপুল আয় আছে, বহুব্যয়সাধ্য নিমন্ত্রণ - আমন্ত্রণে তাহাদেরও টানাটানি পড়িয়াছে, যাহাদের অল্প আয় তাহাদের তো কথাই নাই। ইহাতে লোকের বিবাহে অপ্রবৃত্তি হইয়া তাহার বহুবিধ কুফল ফলিতেছে।

এই ভোগ এবং আড়ম্বরের ঢেউ আমাদের দেশেও যে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা কাহারো অগোচর নহে। অথচ আমাদের দেশে আয়ের পথ বিলাতের অপেক্ষা সংকীর্ণ। শুধু তাই নয়। দেশের উন্নতির উদ্দেশ্যে যে - সকল আয়োজন আবশ্যক, অর্থাভাবে আমাদের দেশে তাহা সমস্তই অসম্পূর্ণ।

আড়ম্বরের একটা উদ্দেশ্য লোকের কাছে বাহবা পাওয়া। এই বাহবা পাইবার প্রবৃত্তি এখনকার চেয়ে পূর্বকালে অল্প ছিল। সে কথা মানিতে পারি না। তখনো লোকসমাজে খ্যাত হইবার ইচ্ছা নিঃসন্দেহ এখনকার

মতোই প্রবল ছিল। তবে প্রভেদ এই, তখন খ্যাতির পথ এক দিকে ছিল, এখন খ্যাতির পথ অন্য দিকে হইয়াছে।

তখনকার দিনে দানধ্যান, ক্রিয়াকর্ম, পূজাপার্বণ ও পূর্তকার্যে ধনী ব্যক্তিরা খ্যাতি লাভ করিতেন। এই খ্যাতির প্রলোভনে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত কর্মানুষ্ঠানে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়াছেন, এমন ঘটনা শুনা গেছে।

কিন্তু, এ কথা স্বীকার করতে হইবে যে, যে - আড়ম্বরের গতি নিজের ভোগলালসা তৃপ্তির দিকে নহে, তাহা সাধারণত নিতান্ত অসংযত হইয়া উঠে না, এবং তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ভোগের আদর্শকে বাড়াইয়া তুলিয়া চতুর্দিকে বিলাসের মহামারী সৃষ্টি করে না। মনে করো, যে - ধনীর গৃহে নিত্য অতিথিসেবা ছিল, তাঁহার এই সেবার ব্যয় যতই বেশি হউক না অতিথিরা যে - আহার পাইতেন তাহাতে বিলাসিতার চর্চা হইত না। বিবাহাদি কর্মে রবাহূত অনাহূতদের নিষেধ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার ফলে যজ্ঞের আয়োজন বৃহৎ হইলেও যথেষ্ট সরল হইত। ইহাতে সাধারণ লোকের চালচলন বাড়িয়া যাইত না।

এখনকার দিনে ব্যক্তিগত ভোগের আদর্শ বাড়িয়া উঠিয়াছে, এইজন্য বাহবার স্রোত সেই মুখেই ফিরিয়াছে। এখন আহার পরিচ্ছদ, বাড়ি গাড়ি জুড়ি, আসবাবপত্র দ্বারা লোকে আপন মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। ধনীতে ধনীতে এখন এই লইয়া প্রতিযোগিতা। ইহাতে যে কেবল তাহাদেরই চাল বাড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে, যাহারা অশক্ত তাহাদেরও বাড়িতেছে। আমাদের দেশে ইহাতে যে কতদূর পর্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ, আমাদের সমাজের গঠন এখনো বদলায় নাই। এ সমাজ বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট। দূর নিকট, স্বজন পরিজন, অনুচর পরিচয়, কাহাকেও এ সমাজ অস্বীকার করে না। অতএব এ সমাজের ক্রিয়াকর্ম বৃহৎ হইতে গেলেই সরল হওয়া অত্যাবশ্যক। না হইলে মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে।

পূর্বেই বলিয়াছি এ পর্যন্ত আমাদের সামাজিক কর্মে এই সরলতা ও বিপুলতার সামঞ্জস্য ছিল ; এখন সাধারণের চালচলন বাড়িয়া গেছে

অথচ এখন আমাদের সমাজের পরিধি সে পরিমাণে সংকুচিত হয় নাই, এই জন্য সাধারণ লোকের সমাজকৃত্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি জানি, এক ব্যক্তি ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম করে। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে পর পিতৃবিয়োগের অপেক্ষা শ্রাদ্ধের ভাবনা তাহাকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম, “ তোমার আয়ের অনুপাতে তোমার সাধ্য অনুসারে কর্ম নির্বাহ করো - না কেন। ” সে বলিল, তাহার কোনো উপায় নাই, গ্রামের লোক ও আত্মীয়কুটুম্বমণ্ডলীকে না খাওয়াইলে তাহার বিপদ ঘটিবে। এই দরিদ্রের প্রতি সমাজের দাবি সম্পূর্ণই রহিয়াছে অথচ সমাজের ক্ষুধা বাড়িয়া গেছে। পূর্বে যেরূপ আয়োজনে সাধারণে তৃপ্তি হইত এখন আর তাহা হয় না। যাঁহারা ক্ষমতাশালী ধনী লোক, তাঁহারা সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারেন। তাঁহারা শহরে আসিয়া কেবলমাত্র বন্ধুমণ্ডলীকে লইয়া সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সংগতিপন্ন নহেন, তাঁহাদের পলাইবার পথ নাই।

আমরা বীরভূম জেলায় একজন কৃষিজীবী গৃহস্থের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গৃহস্বামী তাহার ছেলেকে চাকরি দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করাতে আমি বলিলাম, “ কেন রে, ছেলেকে চাষবাস ছাড়াইয়া পরের অধীন করিবার চেষ্টা করিস কেন। ” সে কহিল, “ বাবু, একদিন ছিল যখন জমিজমা লইয়া আমরা সুখেই ছিলাম। এখন শুধু জমিজমা হইতে আর দিন চলিবার উপায় নাই। ” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ কেন বল্ তো? ” সে উত্তর করিল, “ আমাদের চাল বাড়িয়া গেছে। পূর্বে বাড়িতে কুটুম্ব আসিলে চিঁড়াগুড়েই সন্তুষ্ট হইত, এখন সন্দেশ না পাইলে নিন্দা করে। আমরা শীতের দিনে দোলাই গায়ে দিয়া কাটাইয়াছি, এখন ছেলেরা বিলাতি র‍্যাপার না পাইলে মুখ ভারী করে। আমরা জুতা পায়ে না দিয়াই শ্বশুরবাড়ি গেছি, ছেলেরা বিলাতি জুতা না পরিলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে। তাই চাষ করিয়া আর চাষার চলে না। ”

কেহ কেহ বলিবেন, এ - সমস্ত ভালো লক্ষণ ; অভাবের তাড়নায় মানুষকে সচেষ্ট করিয়া তোলে। ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিকাশের উত্তেজনা জন্মে। কেহ কেহ এমনও বলিবেন, বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজ

ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া নষ্ট করে। অভাবের দায়ে এই সমাজের বহুবন্ধনপাশ শিথিল হইয়া গেলে মানুষ স্বাধীন হইবে। ইহাতে দেশের মঙ্গল।

এ - সমস্ত তর্কের মীমাংসা সংক্ষেপে হইবার নহে। য়ুরোপে ভোগের তাগিদ দিয়া অনেকগুলি লোককে মারিয়া কতকগুলি লোককে ক্ষমতাশালী করিয়া তোলে। হিন্দু সমাজতন্ত্রে কতকগুলি লোককে অনেকগুলি লোকের জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া সমাজকে ক্ষমতাশালী করিয়া রাখে, এই উভয় পন্থাতেই ভালো মন্দ দুইই আছে। য়ুরোপীয় পন্থাই যদি একমাত্র শ্রেয় বলিয়া সপ্রমাণ হইত তাহা হইলে এ বিষয়ে কোনো কথাই ছিল না। য়ুরোপের মনীষিগণের কথায় অবধান করিলে জানা যায় যে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ আছে।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের হিন্দুসমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তহে ইহা নিশ্চয় যে বহু সহস্র বৎসরে হিন্দুজাতি যে - অটল আশ্রয়ে বহু ঝড় - ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার স্থানে নূতন আর - কিছু গড়িয়া উঠিবে কি না, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কিরূপ নির্ভর দিতে পারিবে, তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে, আমাদের যাহা আছে, নিশ্চিন্তমনে তাহার বিনাশদশা দেখিতে পারিব না।

মুসলমানের আমলে হিন্দুসমাজের যে কোনো ক্ষতি হয় নাই তাহার কারণ, সে - আমলে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের টাকা ভারতবর্ষেই থাকিত, বাহিরের দিকে তাহার টান না পড়াতে আমাদের অন্নের স্বচ্ছলতা ছিল। এই কারণে আমাদের সমাজব্যবহার সহজেই বহুব্যাপক ছিল। তখন ধনোপার্জন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তাকে এমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই। তখন সমাজে ধনের মর্যাদা অধিক ছিল না এবং ধনই সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলিয়া গণ্য ছিল না। ধনশালী বৈশ্যগণ যে সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন তাহাও নহে। এই কারণে, ধনকে শ্রেষ্ঠ আসন দিলে জনসাধারণের মনে যে হীনতা আসে, আমাদের দেশে তাহা ছিল না।

মুসলমানসমাজে বিলাসিতা যথেষ্ট ছিল এবং তাহা হিন্দুসমাজকে যে একেবারে স্পর্শ করে নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বিলাসিতা সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় নাই। তখনকার দিনে বিলাসিতাকে নবাবী বলিত। অল্প লোকেরই সে নবাবী চাল ছিল। এখনকার দিনে বিলাসিতাকে বাবুগিরি বলে, দেশে বাবুর অভাব নাই।

এখন টাকা সম্বন্ধে সমাজস্থ সকলেই অত্যন্ত বেশি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য আমাদের সমাজেও এমন - একটা দীনতা আসিয়াছে যে টাকা নাই ইহাই স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে লজ্জাকর হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে ধনাড়ম্বরের প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে, লোকে ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করে, সকলেই প্রমাণ করিতে বসে যে আমি ধনী। বণিকজাতি রাজসিংহাসনে বসিয়া আমাদিগকে এই ধনদাসত্বের দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিয়াছে।

এই বাবুয়ানার প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠায় আমরা যে কত দিক হইতে কত দুঃখ পাইতেছি, তাহার সীমা নাই। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখো। এক দিকে আমাদের সমাজবিধানে কন্যাকে একটা বিশেষ বয়সে বিবাহ দিতে সকলে বাধ্য, অন্য দিকে পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহ করা চলে না। গৃহস্থজীবনের ভার বহন করিতে যুবকগণ সহজেই শঙ্কা বোধ করে। এমন অবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতে হইলে পাত্রকে যে পণ দিয়া ভুলাইতে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য কী আছে। পণের পরিমাণও জীবনযাত্রার বর্তমান আদর্শ অনুসারে যা বাড়িয়া যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য নাই। এই পণ - লওয়া প্রথার বিরুদ্ধে আজকাল অনেক আলোচনা চলিতেছে ; বস্তুত ইহাতে বাঙালি গৃহস্থের দুঃখ যে অত্যন্ত বাড়িয়াছে তাহাতেও সন্দেহমাত্র নাই, কন্যার বিবাহ লইয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া নাই এমন কন্যার পিতা আজ বাংলাদেশে অল্পই আছে। অথচ, এজন্য আমাদের বর্তমান সাধারণ অবস্থা ছাড়া ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া যায় না। এক দিকে ভোগের আদর্শ উচ্চ হইয়া সংসারযাত্রা বহুব্যয়সাধ্য ও অপর দিকে কন্যা - মাত্রকেই নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে বাধ্য হইলে পাত্রের আর্থিক মূল্য না বাড়িয়া গিয়া থাকিতে পারে না। অথচ এমন লজ্জাকর ও

অপমানকর প্রথা আর নাই। জীবনের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারি দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয়শ্রেণীতে গণ্য হইবে আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্মমভাবে দরদাম করিতে থাকা—এমন দুঃসহ নীচতা যে - সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে - সমাজের কল্যাণ নাই, সে - সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা এই অমঙ্গল দূর করিতে চান তাঁহারা ইহার মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া যদি ডাল ছাঁটিবার চেষ্টা করেন তবে লাভ কী। প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন, সংসারভারকে লঘু করুন, ভোগের আড়ম্বরকে খর্ব করুন, তবে লোকের পক্ষে গৃহী হওয়া সহজ হইবে, টাকার অভাব ও টাকার আকাঙ্ক্ষাই সর্বোচ্চ হইয়া উঠিয়া মানুষকে এতদূর পর্যন্ত নির্লজ্জ করিবে না। গৃহই আমাদের দেশের সমাজের ভিত্তি, সেই গৃহকে যদি আমরা সহজ না করি, মঙ্গল না করি, তাহাকে ত্যাগের দ্বারা নির্মল না করি, তবে অর্থোপার্জনের সহস্র নূতন পথ আবিষ্কৃত হইলেও দুর্গতি হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই।

একবার ভাবিয়া দেখো, আজ চাকরি সমস্ত বাঙালি ভদ্রসমাজের গলায় কী ফাঁসই টানিয়া দিয়াছে। এই চাকরি যতই দুর্লভ হইতে থাক্, ইহার প্রাপ্য যতই স্বল্প হইতে থাক্, ইহার অপমান যতই দুঃসহ হইতে থাক্ , আমরা ইহারই কাছে মাথা পাতিয়া দিয়াছি। এই দেশব্যাপী চাকরির তাড়নায় আজ সমস্ত বাঙালিজাতি দুর্বল, লাঞ্ছিত, আনন্দহীন। এই চাকরির মায়ায় বাংলার বহুতর সুযোগ্য শিক্ষিত লোক কেবল যে অপমানকেই সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিতেছে তাহা নহে, তাহারা দেশের সহিত ধর্মসম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইতেছে। আজ তাহার দৃষ্টান্ত দেখো। বিধাতার লীলাসমুদ্র হইতে জোয়ার আসিয়া আজ যখন সমস্ত দেশের হৃদয়স্রোত আত্মশক্তির পথে মুখ ফিরাইয়াছে তখন বিমুখ কারা। তখন গোয়ান্দাগিরি করিয়া সত্যকে মিথ্যা করিয়া তুলিতেছে কারা। তখন ধর্মাধিকরণে বসিয়া অন্যায়ের দণ্ডে দেশপীড়নের সাহায্য করিতেছে কারা। তখন বালকদের অতি পবিত্র গুরুসম্বন্ধ গ্রহণ করিয়াও তাহাদিগকে

অপমান ও নির্যাতনের হস্তে অনায়াসে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছে কারা। যারা চাকরির ফাঁস গলায় পরিয়াছে। তারা যে কেবল অন্যায় করিতে বাধ্য হইতেছে তাহা নয়, তারা নিজেকে ভুলাইতেছে, তারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে যে দেশের লোক ভুল করিতেছে। বলো দেখি, দেশের যোগ্যতম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কণ্ঠে এই - যে চাকরি - শিকলের টান, ইহা কী প্রাণান্তকর টান। এই টানকে আমরা প্রত্যহই বাড়াইয়া তুলিতেছি কী করিয়া। নবাবিয়ানা, সাহেবিয়ানা, বাবুয়ানাকে প্রত্যহই উগ্রতর করিয়া মনকে বিলাসের অধীন করিয়া আপন দাসখতের মেয়াদ এবং কড়ার বাড়াইয়া চলিয়াছি।

জীবনযাত্রাকে লঘু করিয়া মাত্র দেশব্যাপী এই চাকরির ফাঁসি এক মুহূর্তে আলগা হইয়া যাইবে। তখন চাষবাস বা সামান্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে ভয় হইবে না। তখন এত অকাতরে অপমান সহ্য করিয়া পড়িয়া থাকা সহজ হইবে না।

আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে ইহা আমাদের ধনবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু এ কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্বে যে অর্থ সাধারণের কার্যে ব্যয়িত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে, শহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলাদেশে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নান - পানের অযোগ্য হইতেছে, গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং যে - দেশ বারো মাসে তেরো পার্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত সে - দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। দেশের অধিকাংশ অর্থ শহরে আকৃষ্ট হইয়া, কোঠাবাড়ি গাড়িঘোড়া সাজসরঞ্জাম আহারবিহারেই উড়িয়া যাইতেছে। অথচ যাঁহারা এইরূপ ভোগবিলাসে ও আড়ম্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় কেহই সুখে স্বচ্ছন্দে নাই ; তাঁহাদের অনেকেরই টানাটানি, অনেকেরই

ঋণ, অনেকেরই পৈতৃক সম্পত্তি মহাজনের দায়মুক্ত করিবার জন্য চিরজীবন নষ্ট হইতেছে–কন্যার বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে মানুষ করিয়া তোলা, পৈতৃক কীর্তি রক্ষা করিয়া চলা, অনেকেরই পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। যে - ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাবমোচনের জন্য চারি দিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্যের মায়া সৃজন করিতেছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। দেশের ধর্মস্থানকে বন্ধুস্থানকে জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া, কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে, বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেইজন্য এই ছদ্মবেশী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

www.bengaliebook.com

কোর্ট বা চাপকান

আজকাল একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দেশে দেখা যায়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাতি পোশাক পরেন, স্ত্রীগণকে তাঁহারা শাড়ি পরাইয়া বাহির করিতে কুণ্ঠিত হন না। একাসনে গাড়ির দক্ষিণভাগে হ্যাট কোট, বামভাগে বোম্বাই শাড়ি। নব্য বাংলার আদর্শে হরগৌরীরূপ যদি কোনো চিত্রকর চিত্রিত করেন, তবে তাহা যদিবা ‘ সাব্লাইম' না হয়, অন্তত সাব্লাইমের অদূরবর্তী আর - একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইবে।

পশুপক্ষীর রাজ্যে প্রকৃতি অনেক সময় স্ত্রীপুরুষের সাজের এত প্রভেদ করেন যে, দম্পতীকে একজাতীয় বলিয়া চেনা বিশেষ অভিজ্ঞতাসাধ্য হইয়া পড়ে। কেশরের অভাবে সিংহীকে সিংহের পত্নী বলিয়া চেনা কঠিন এবং কলাপের অভাবে ময়ূরের সহিত ময়ূরীর কুটুম্বিতানির্ণয় দুরূহ।

বাংলাতেও যদি প্রকৃতি তেমন একটা বিধান করিয়া দিতেন, স্বামী যদি তাঁহার নিজের পেখম বিস্তার করিয়া সহধর্মিণীর উপরে টেক্কা দিতে পারিতেন, তাহা হইলে কোনো কথাই উঠিত না। কিন্তু গৃহকর্তা যদি পরের পেখম পুচ্ছে গুঁজিয়া ঘরের মধ্যে অনৈক্য বিস্তার করেন, তাহা হইলে সেটা যে কেবল ঘরের পক্ষে আপসোসের বিষয় হয় তাহা নহে, পরের চক্ষে হাস্যেরও বিষয় হইয়া ওঠে।

যাহা হউক, ব্যাপারটা যতই অসংগত হউক, যখন ঘটিয়াছে তখন ইহার মধ্যে সংগত কারণ একটুকু আছেই।

আমরা যে - কারণটি নির্ণয় করিয়াছি তাহার মধ্যে আমাদের মনের কতকটা সান্ত্বনা আছে। অন্তত সেইজন্যই আশা করি এইটেই যথার্থ কারণ। সে কারণ নির্দেশ করিবার পূর্বে বিষয়টা একটু বিস্তারিতভাবে সমালোচনা করা যাক।

ইংরেজি কাপড়ের একটা মস্ত অসুবিধা এই যে, তাহার ফ্যাশনের উৎস ইংলণ্ডে। সেখানে কী কারণবশত কিরূপ পরিবর্তন চলিতেছে আমরা

তাহা জানি না, তাহার সহিত আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ সংস্রবমাত্র নাই। আমাদিগকে চেষ্টা করিয়া খবর লইতে এবং সাবধানে অনুকরণ করিতে হয়। যাঁহারা নূতন বিলাত হইতে আসেন তাঁহারা সাবেক দলের কলার এবং প্যান্টলুনের ছাঁট দেখিয়া মনে মনে হাস্য করেন, এবং সাবেকদলেরা নব্যদলের সাজসজ্জার নব্যতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে "ফ্যাশানেব্‌ল" বলিয়া হাস্য করিতে ত্রুটি করেন না।

ফ্যাশানের কথা ছাড়িয়া দেও। সকল দেশেরই বেশভূষার একটা ভদ্রতার আদর্শ আছে। যে - দেশে কাপড় না পরিয়া উলকি পরে সেখানেও উলকির ইতরবিশেষ ভদ্র অভদ্র চিহ্নিত হয়। ইংরেজি ভদ্রকাপড়ের সেই আদর্শ আমরা কোথা হইতে সংগ্রহ করিব। তাহা আমাদের ঘরের মধ্যে আমাদের সমাজের মধ্যে নাই। সে আদর্শ আমরা নিজের ভদ্রতাগৌরবে আমাদের নিজের সুরুচি ও সুবিচারের দ্বারা, আমাদের আপনাদের ভদ্রমণ্ডলীর সাহায্যে স্বাধীনভাবে গঠিত করিতে পারি না। আমাদিগকে ভদ্র সাজিতে হয় পরের ভদ্রতা - আদর্শ অনুসন্ধান করিয়া লইয়া।

যাহাদের নিকট হইতে অনুসন্ধান এবং ধার করিয়া লইতে হইবে, তাহাদের সমাজে আমাদের গতিবিধি নাই। তাহাদের দোকান হইতে আমরা ঈভনিং কোর্তা কিনি, কিন্তু তাহাদের নিমন্ত্রণে সেটা ব্যবহার করিবার সুযোগ পাই না।

এমন অবস্থায় ক্রমে দোকানে - কেনা আদর্শ হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয়। ক্রমে কলারের শুভ্রতায় টাইয়ের বন্ধনে প্যান্টলুনের পরিধিতে শৈথিল্য আসিয়া পড়ে। শুনিতে পাই ইংরেজিবেশী বাঙালির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত আজকাল প্রায় দেখা যায়।

একে বিলাতি সাজ স্বভাবতই বাঙালিদেহে অসংগত, তাহার উপরে যদি তাহাতে ভদ্রোচিত পারিপাট্য না থাকে, তবে তাহাতে হাসিও আসে অবজ্ঞাও আনে। এ কথা সহজেই মুখে আসে যে, যদি পরিতে না জান এবং শক্তি না থাকে, তবে পরের কাপড়ে সাজিয়া বেড়াইবার দরকার কী ছিল।

ইংরেজি কাপড়ে ‘ খেলো' হইলে যত খেলো এবং যত দীন দেখিতে হয়, এমন দেশী কাপড়ে নয়। তাহার একটা কারণ ইংরেজি সাজে সারল্য নাই, তাহার মধ্যে আয়োজন এবং চেষ্টার বাহুল্য আছে। ইংরেজি কাপড় যদি গায়ে ফিট না হইল, যদি তাহাতে টানাটানি প্রকাশ পাইল, তবে তাহা ভদ্রতার পক্ষে অত্যন্ত বেআবরু হইয়া পড়ে ; কারণ, ইংরেজি কাপড়ের আগাগোড়ায় গায়ে ফিট করিবার চরম উদ্দেশ্য, দেহটাকে খোসার মতো মুড়িয়া ফেলিবার সযত্ন চেষ্টা সর্বদা বর্তমান। সুতরাং প্যান্টলুন যদি একটু খাটো হয়, কোট যদি একটু উঠিয়া পড়ে, তবে নিজেকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়, সেইটুকুতেই আত্মসম্মানের লাঘব হইতে থাকে–যে - ব্যক্তি এ সম্বন্ধে অজ্ঞতাসুখে অচেতন, অন্যলোকে তাহার হইয়া লজ্জা বোধ করে।

যাঁহারা আজকাল ইংরেজি বস্ত্র ধরিয়াছেন লক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকুন, তাঁহাদিগকে কখনো যেন চাঁদনিতে ঢুকিতে না হয়। কিন্তু তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা সকলেই যে র্যানকিনের বাড়ি গতিবিধি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, এমন আশা কিছুতেই করা যায় না। অথচ পৈতৃক বেশের সহিত পৈতৃক দুর্বলতাটুকুও যদি তাহারা পায়, সহেবিয়ানা পরিহার করিবার শক্তি যদি তাহাদের না থাকে, তবে তাহাদের সম্মুখে দারুণ চুনাগলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না।

যাঁহারা বিলাতে গিয়াছেন তাঁহারা বিলাতি বসনভূষণের অন্ধিসন্ধি কতকটা বুঝিয়া চলিতে পারেন ; যাঁহারা যান নাই তাঁহারা অনেক সময় অদ্ভুত কাণ্ড করেন। তাঁহারা দার্জিলিঙের প্রকাশ্যপথে ড্রেসিংগাউন পরিয়া বেড়ান, এবং ছোটো কন্যাকে মলিন সাদা ফুলমোজার উপরে বিলাতি ফ্রক এবং টুপি উলটা করিয়া পরাইয়া সভায় লইয়া আসেন।

এ সম্বন্ধে দুটো কথা আছে। প্রথমে ঠিক দস্তুর - মতো ফ্যাশান - মতো কাপড় পরিতেই হইবে, এমন কী মাথার দিব্য আছে। এ কথাটা খুব বড়োলোকের, খুব স্বাধীনচেতার মতো কথা বটে। দশের দাসত্ব, প্রথার গোলামি, এ - সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে ধিক্। কিন্তু এ স্বাধীনতার কথা তাহাকে শোভা পায় না যে–লোক গোড়াতেই বিলাতি সাজ পরিয়া

www.bengaliebook.com

অনুকরণের দাসখত আপাদমস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছে। পাঁঠা যদি নিজের হয়, তবে তাহাকে কাটা সম্বন্ধেও স্বাধীনতা থাকে ; নিজেদের ফ্যাশানে যদি চলি, তবে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াও মহত্ত্ব দেখাইতে পারি। পরের পথেও চলিব, আবার সে - পথ কলুষিতও করিব, এমন বীরত্বের মহত্ত্ব বোঝা যায় না।

আর - একটা কথা এই যে, যেমন ব্রাহ্মণের পইতা তেমনই বিলাতফেরতের বিলাতি কাপড়, ওটা সাম্প্রদায়িক লক্ষণরূপে স্বতন্ত্র করা কর্তব্য। কিন্তু সে বিধান চলিবে না। গোড়ায় সেই - মতোই ছিল বটে, কিন্তু আজকাল সমুদ্র পার না হইয়াও অনেকে চিহ্নধারণ করিতে শুরু করিয়াছেন। আমাদর উর্বর দেশে ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতি যে - কোনো ব্যাধি আসিয়াছে, ব্যাপ্ত না হইয়া ছাড়ে নাই ; বিলাতি কাপড়েরও দিন আসিয়াছে ; ইহাকে দেশের কোনো অংশবিশেষে পৃথক্‌করণ কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে।

দীন ভারতবর্ষ যেদিন ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্রে ভূষিত হইয়া দাঁড়াইবে, তখন তাহার দৈন্য কী বীভৎস বিজাতীয় মূর্তি ধারণ করিবে। আজ যাহা কেবলমাত্র শোকাবহ আছে সেদিন তাহা কী নিষ্ঠুর হাস্যজনক হইয়া উঠিবে। আজ যাহা বিরল - বসনের সরল নম্রতার দ্বারা সংবৃত সেদিন তাহা জীর্ণ কোর্তার ছিদ্রপথে অর্ধাবরণের ইতরতায় কী নির্লজ্জভাবে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবে। চুনাগলি যেদিন বিস্তীর্ণ হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে আসিবে, সেদিন যেন ভারতবর্ষ একটি পা মাত্র অগ্রসর হইয়া তাঁহারই সমুদ্রের ঘাটে তাঁহার মলিন প্যান্টলুনের ছিন্ন প্রান্ত হইতে ভাঙা টুপির মাথাটা পর্যন্ত নীলাম্বুরাশির মধ্যে নিলীন করিয়া নারায়ণের অনন্তশয়নের অংশ লাভ করেন।

কিন্তু এ হল সেন্টিমেন্ট, ভাবুকতা—প্রকৃতিস্থ কাজের লোকের মতো কথা ইহাকে বলা যায় না। ইহা সেন্টিমেন্ট বটে। মরিব তবু অপমান সহিব না, ইহাও সেন্টিমেন্ট। যাহারা আমাদিগকে ক্রিয়া - কর্মে আমোদপ্রমোদ সামাজিকতায় সর্বতোভাবে বাহিরে ঠেলিয়া রাখে, আমরা তাহাদিগকে পূজার উৎসবে ছেলের বিবাহে বাপের অন্ত্যেষ্টিসৎকারে ডাকিয়া আনিব না, ইহাও

সেন্টিমেন্ট। বিলাতি কাপড় ইংরেজের জাতীয় গৌরবচিহ্ন বলিয়া সেই ছদ্মবেশে স্বদেশকে অপমানিত করিব না, ইহাও সেন্টিমেন্ট। এই - সমস্ত সেন্টিমেন্টেই দেশের যথার্থ বল, দেশের যথার্থ গৌরব ; অর্থে নহে, রাজপদে নহে, ডাক্তারির নৈপুণ্য অথবা আইন ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনে নহে।

আশা করিতেছি এই সেন্টিমেন্টের কিঞ্চিৎ আভাস আছে বলিয়াই বিলাতি বেশধারীগণ অত্যন্ত অসংগত হইলেও তাঁহাদের অর্ধাঙ্গিনীদের শাড়ি রক্ষা করিয়াছেন।

পুরুষেরা কর্মক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য ভাবগৌরবকে বলিদান দিতে অনেকে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু স্ত্রীগণ যেখানে আছেন সেখানে সৌন্দর্য এবং ভাবুকতার রাহুরূপী কর্ম আজিও আসিয়া প্রবেশ করে নাই। সেইখানে একটু ভাবরক্ষার জায়গা রহিয়াছে, সেখানে আর স্ফীতোদর গাউন আসিয়া আমাদের দেশীয় ভাবের শেষ লক্ষণটুকু গ্রাস করিয়া যায় নাই।

সাহেবিয়ানাকেই যদি চরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হইলে স্ত্রীকে বিবি না সাজাইয়া স - গৌরব অর্ধেক অসম্পূর্ণ থাকে। তাহা যখন সাজাই নাই, তখন শাড়িপরা স্ত্রীকে বামে বসাইয়া এ কথা প্রকাশ্যে কবুল করিতেছি যে, আমি যাহা করিয়াছি তাহা সুবিধার খাতিরে–দেখো, ভাবের খাতির রক্ষা করিয়াছি আমার ঘরের মধ্যে, আমার স্ত্রীগণের পবিত্র দেহে।

কিন্তু আমরা আশঙ্কা করিতেছি, ইহাদের অনেকেই এই প্রসঙ্গে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বলিবেন। বলিবেন, পুরুষের উপযোগী জাতীয় পরিচ্ছদ তোমাদের আছে কোথায় যে আমরা পরিব? ইহাকেই বলে আঘাতের উপরে অবমাননা। একে তো পরিবার বেলা ইচ্ছাসুখেই বিলাতি কাপড় পরিলেন, তাহার পর বলিবার বেলা সুর ধরিলেন যে, তোমাদের কোনো কাপড় ছিল না বলিয়াই আমাদিগকে এই বেশ ধরিতে হইয়াছে। আমরা পরের কাপড় পরিয়াছি বটে, কিন্তু তোমাদের কোনো কাপড়ই নাই–সে আরো খারাপ।

বাঙালি সাহেবেরা ব্যঙ্গসুরে অবজ্ঞা করিয়া বলেন, তোমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিতে গেলে পায়ে চটি, হাঁটুর উপরে ধুতি এবং কাঁধের উপরে একখানা চাদর পরিতে হয় ; সে আমরা কিছুতেই পারিব না। শুনিয়া ক্ষোভে নিরুত্তর হইয়া থাকি।

যদিও কাপড়ের উপর মানুষ নির্ভর করে না, মানুষের উপর কাপড় নির্ভর করে ; এবং সে হিসাবে মোটা ধুতি চাদর লেশমাত্র লজ্জাকর নহে। বিদ্যাসাগর, একা বিদ্যাসাগর নহেন, আমাদের দেশে বহুসংখ্যক মোটা চাদরধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহিত গৌরবে গাম্ভীর্যে কোর্তাগ্রস্ত কোনো বিলাতফেরতই তুলনীয় হইতে পারেন না। যে - ব্রাহ্মণেরা এককালে ভারতবর্ষকে সভ্যতার উচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের বসনের একান্ত বিরলতা জগদ্‌বিখ্যাত। কিন্তু সে - সকল তর্ক তুলিতে চাহি না। কারণ সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে, এবং সেই পরিবর্তনের একেবারে বিপরীতমুখে চলিতে গেলে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

অতএব এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলাদেশে যে - ভাবে ধুতি চাদর পরা হয়, তাহা আধুনিক কাজকর্ম এবং আপিস - আদালতের উপযোগী নয়। কিন্তু আচকান - চাপকানের প্রতি সে - দোষারোপ করা যায় না।

সাহেবী বেশধারীরা বলেন, ওটাও তো বিদেশী সাজ। বলেন বটে, কিন্তু সে একটা জেদের তর্ক মাত্র। অর্থাৎ বিদেশী বলিয়া চাপকান তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, সাহেব সাজিবার একটা কোনো বিশেষ প্রলোভন আছে বলিয়াই ত্যাগ করিয়াছেন।

কারণ যদি চাপকান এবং কোট দুটোই তাঁহার নিকট সমান নূতন হইত, যদি তাঁহাকে আপিসে প্রবেশ ও রেলগাড়িতে পদার্পণ করিবার দিন দুটোর মধ্যে একটা প্রথম বাছিয়া লইতে হইত, তাহা হইলে এ - সকল তর্কের উত্থাপন হইতে পারিত।

চাপকান তাঁহার গায়েই ছিল, তিনি সেটা তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাহা ত্যাগ করিয়া সেদিন কালো কুর্তির মধ্যে প্রবেশপূর্বক

www.bengaliebook.com

গলায় টাই বাঁধিলেন, সেদিন আনন্দে এবং গৌরবে এ তর্ক তোলেন নাই যে, পিতা ও চাপকানটা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন।

তোলাও সহজ নহে, কারণ চাপকানের ইতিবৃত্ত ঠিক তিনিও জানেন না, আমিও জানি না। কেননা মুসলমানদের সহিত বসনভূষণ শিল্পসাহিত্যে আমাদের এমন ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান হইয়া গেছে যে, উহার মধ্যে কতটা কার, তাহার সীমা নির্ণয় করা কঠিন। চাপকান হিন্দু - মুসলমানের মিলিত বস্ত্র। উহা যে - সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েই সহায়তা করিয়াছে। এখনো পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন রাজাধিকারে চাপকানের অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায় ; সে - বৈচিত্র্যে যে একমাত্র মুসলমানের কর্তৃত্ব তাহা নহে ., তাহার মধ্যে হিন্দুরও স্বাধীনতা আছে।

যেমন আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত মুসলমানেরও বটে হিন্দুরও বটে, তাহাতে উভয়জাতীয় গুণীরই হাত আছে ; যেমন মুসলমান রাজ্যপ্রণালীতে হিন্দু মুসলমান উভয়ের স্বাধীন ঐক্য ছিল।

তাহা না হইয়া যায় না। কারণ মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। তাহাদের শিল্পবিলাস ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই ; এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনই স্বভাবের অমোঘ নিয়মে কেবল আপন বিপুলতা আপন নিগূঢ় প্রাণশক্তি দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন , সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য - নির্মাণ, দন্তকার্য, নৃত্য, গীত এবং রাজকার্য, মুসলমানের আমলে ইহার কোনোটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই ; উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে। তখন ভারতবর্ষের যে একটি বাহ্যবরণ নির্মিত হইতেছিল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের ডান হাত ও বাম হাত লইয়া টানা ও পোড়েন বুনিতেছিল।

অতএব এই মিশ্রণের মধ্যে চাপকানের খাঁটি মুসলমানত্ব যিনি গায়ের জোরে প্রমাণ করিতে চান, তাঁহাকে এই কথা বলিতে হয় যে, তোমার যখন গায়ের এতই জোর, তখন কিছুমাত্র প্রমাণ না করিয়া ঐ গায়ের

জোরেই হ্যাটকোট অবলম্বন করো ; আমরা মনের আক্ষেপ নীরবে মনের মধ্যে পরিপাক করি।

এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না। যদি বিধাতার কৃপায় কোনোদিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হইতে পারে, তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের এক হওয়াও বিচিত্র হইবে না। হিন্দু মুসলমানের ধর্মে না - ও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে– আমাদের শিক্ষা আমাদের চেষ্টা আমাদের মহৎ স্বার্থ সেই দিকে অনবরত কাজ করিতেছে। অতএব যে - বেশ আমাদের জাতীয় বেশ হইবে তাহা হিন্দু মুসলমানের বেশ।

যদি সত্য হ . য়, চাপকান পায়জামা একমাত্র মুসলমানদেরই উদ্ ভাবিত সজ্জা, তথাপি এ কথা যখন স্মরণ করি, রাজপুতবীরগণ শিখসর্দারবর্গ এই বেশ পরিধান করিয়াছেন, রাণাপ্রতাপ রণজিৎ সিংহ এই চাপকান পায়জামা ব্যবহার করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তখন মিস্টার ঘোষ - বোস - মিত্র, চাটুয্যে - বাঁড়ুয্যে - মুখুয্যের এ বেশ পরিতে লজ্জার কারণ কিছুই দেখি না।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক কথা এই যে, চাপকান পায়জামা দেখিতে অতি কুশ্রী। তর্ক যখন এইখানে আসিয়া ঠেকে তখন মানে মানে চুপ করিয়া যাওয়া শ্রেয়। কারণ রুচির তর্কের, শেষকালে প্রায় বাহুবলে আসিয়াই মীমাংসা হয়।

নকলের নাকাল

ইংরেজিতে একটি বচন আছে, সাব্লাইম হইতে হাস্যকর অধিক দূর নহে। সংস্কৃত অলংকারে অদ্ভুতরস ইংরেজি সাব্‌লিমিটির প্রতিশব্দ। কিন্তু অদ্ভুত দুই রকমেরই আছে—হাস্যকর অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর অদ্ভুত।

দুইদিনের জন্য দার্জিলিঙে ভ্রমণ করিতে আসিয়া, এই দুই জাতের অদ্ভুত একত্র দেখা গেল। এক দিকে দেবতাত্মা নগাধিরাজ, আর - এক দিকে বিলাতি - কাপড় - পরা বাঙালি। সাব্‌লাইম এবং হাস্যকর একেবারে গায়েগোয়ে সংলগ্ন।

ইংরেজি কাপড়টাই যে হাস্যকর, সে কথা আমি বলি না—বাঙালির ইংরেজি কাপড় পরাটাই যে হাস্যকর, সে - প্রসঙ্গও আমি তুলিতে চাহি না। কিন্তু বাঙালির গায়ে বিসদৃশ রকমের বিলাতি কাপড় যদি করুণা রসাত্মক না হয়, তবে নিঃসন্দেহই হাস্যকর। আশা করি, এ সম্বন্ধে কাহারো সহিত মতের অনৈক্য হইবে না।

হয়তো কাপড় একরকমের, টুপি একরকমের, হয়তো কলার আছ টাই নাই, হয়তো যে - রঙটা ইংরেজের চক্ষে বিভীষিকা সেই রঙের কুর্তি ; হয়তো যে - অঙ্গাবরণকে ঘরের বাহিরে ইংরেজ বিবসন বলিয়া গণ্য করে, সেই অসংগত অঙ্গচ্ছদ। এমনতরো অজ্ঞানকৃত সঙসজ্জা কেন। যদি সম্মুখে কাছা ও পশ্চাতে কোঁচা দিয়া কোনো ইংরেজ বাঙালিটোলায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে সে - ব্যক্তি সম্মানলাভের আশা করিতে পারে না। আমাদের বাঙালি ভ্রাতারা অদ্ভুত বিলাতি সাজ পরিয়া গিরিরাজের রাজসভায় ভাঁড় সাজিয়া ফিরেন, তাঁহারা ঘরের কড়ি খরচ করিয়া ইংরেজ দর্শকের কৌতুকবিধান করিয়া থাকেন।

বেচারা কী আর করিবে। ইংরেজ - দস্তুর সে জানিবে কী করিয়া। যে বিলাতফেরত বাঙালি দস্তুর জানেন, তাঁহার স্বদেশীয়ের এই বেশবিভ্রমে তিনিই সব চেয়ে লজ্জাবোধ করেন। তিনিই সব চেয়ে তীব্রস্বরে বলিয়া

থাকেন, যদি না জানে তবে পরে কেন। আমাদের সুদ্ধ ইংরেজের কাছে অপদস্থ করে।

না পরিবে কেন। তুমি যদি পর, এবং পরিয়া দেশীপরিচ্ছদধারীর চেয়ে নিজেকে বড়ো মনে কর, তবে সে - গর্ব হইতে সেই - বা বঞ্চিত হইবে কেন। তোমার যদি মত হয় যে, আমাদের স্বদেশীয় সজ্জা ত্যাজ্য এবং বিদেশী পোশাকই গ্রাহ্য, তবে দলপুষ্টিতে আপত্তি করিলে চলিবে না।

তুমি বলিবে, বিলাতি সাজ পরিতে চাও পরো, কিন্তু কোন্‌টা অভদ্র কোন্‌টা সংগত কোন্‌টা অদ্ভুত, সে - খবরটা লও।

কিন্তু সে কখনোই সম্ভব সইতে পারে না। যাহারা ইংরেজিসমাজে নাই, যাহাদের আত্মীয়স্বজন বাঙালি, তাহারা ইংরেজি দস্তুরের আদর্শ কোথায় পাইবে।

যাহাদের টাকা আছে, তাহারা র‍্যাঙ্কিন - হার্মানের হস্তে চক্ষু বুজিয়া আত্মসমর্পণ করে, এবং বড়ো বড়ো চেকে সই করিয়া দেয়, মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করে, নিশ্চয়ই আর কিছু না হউক আমাকে দেখিয়া অন্তত ভদ্র ফিরিঙ্গি বলিয়া লোকে আন্দাজ করিবে–ইংরেজি কায়দা জানে না, এমন মূর্ছাকর অপবাদ কেহ দিতে পারিবে না।

কিন্তু পনেরো - আনা বাঙালিরই অর্থাভাব, এবং চাঁদনিই তাহাদের বাঙালি সজ্জার চরম মোক্ষস্থান। অতএব উলটা - পালটা ভুলচুক হইতেই হইবে। এমন স্থলে পরের সাজ পরিতে গেলে, অধিকাংশ লোকেরই সঙসাজা বৈ গতি নাই।

স্বজাতিকে কেন এমন করিয়া অপদস্থ করা। এমন কাজ কেন, যাহার দৃষ্টান্তে দেশের লোক হাস্যকর হইয়া উঠে। দু - চারিটা কাক অবস্থাবিশেষে ময়ূরের পুচ্ছ মানান - সই করিয়া পরিতেও পারে, কিন্তু বাকি কাকেরা তাহা কোনোমতেই পারিবে না, কারণ ময়ূরসমাজে তাহাদের গতিবিধি নাই, এমন অবস্থায় সমস্ত কাকসম্প্রদায়কে বিদ্রূপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত কয়েকটি ছদ্মবেশীকে ময়ূরপুচ্ছের লোভ

www.bengaliebook.com

সম্বরণ করিতেই হইবে। না যদি করেন, তবে পরপুচ্ছ বিকৃতভাবে আস্ফালনের প্রহসন সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এই লজ্জা হইতে, ইংরেজিয়ানার এই বিকার হইতে, স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কি সক্ষম নকলকারীকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতে পারি না, কারণ, তাঁহারা সক্ষম, আর - সকলে অক্ষম। এমন - কি, অবস্থাবিশেষে তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরাও অক্ষম হইয়া পড়িবে। তাহারা যখন ফিরিঙ্গিলীলার অধস্তন রসাতলের গলিতে গলিতে সমাজচ্যুত আবর্জনার মতো পড়িয়া থাকিবে, তখন কি র‍্যাঙ্কিনবিলাসীর প্রেতাত্মা শান্তিলাভ করিবে।

দরিদ্র কোনোমতেই পরের নকল ভদ্ররকমে করিতে পারে না। নকল করিবার কাঠখড় বেশি। বাহির হইতে তাহার আয়োজন করিতে হয়। যাহাকে নকল করিতে হইবে, সর্বদা তাহার সংসর্গে থাকিতে হয়, দরিদ্রের পক্ষে সেইটেই সর্বাপেক্ষা কঠিন। সুতরাং সে - অবস্থায় নকল করিতে হইলে, আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কিম্ভূতকিমাকার একটা ব্যাপার হইয়া পড়ে। বাঙালির পক্ষে খাটো ধুতি পরা লজ্জাকর নহে, কিন্তু খাটো প্যান্টলুন পরা লজ্জাজনক। কারণ, খাটো প্যান্টলুনে কেবল অসামর্থ্য বুঝায় না, তাহাতে পর সাজিবার যে - চেষ্টা যে - স্পর্ধা প্রকাশ পায়, তাহা দারিদ্র্যের সহিত কিছুতেই সুসংগত নহে।

আজকাল ইংরেজি সাজ কিরূপ চলতি হইয়া আসিতেছে, এবং যতই চলতি হইতেছে ততই তাহা কিরূপ বিকৃত হইয়া উঠিতেছে, দার্জিলিঙের মতো জায়গায় আসিলে অল্পকালের মধ্যেই তাহা অনুভব করা যায়। বাঙালির দুরদৃষ্টি বাঙালিকে অনেক দুঃখ দিয়াছে—পেটে প্লীহা, হাড়ের মধ্যে ম্যালেরিয়া, দেহে কৃশতা, চর্মে কালিমা, ভাণ্ডারে দৈন্য ; অবশেষে তাহাকে কি অদ্ভুত সাজে সাজাইয়া ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করিবে। চিত্তদৌর্বল্যে যখন হাস্যকর করিয়া তোলে, তখন ধরণী দ্বিধা হওয়া ছাড়া লজ্জানিবারণের আর উপায় থাকে না।

আচারব্যবহার সাজসজ্জা উদ্ভিদের মতো, তাহাকে উপড়াইয়া আনিলে শুকাইয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বিলাতি বেশভূষা - আদবকায়দার মাটি এখানে কোথায়। সে কোথা হইতে তাহার অভ্যস্ত রস আকর্ষণ করিয়া সজীব থাকিবে। ব্যক্তিবিশেষ খরচপত্র করিয়া কৃত্রিম উপায়ে মাটি আমদানি করিতে পারেন এবং দিনরাত সযত্নসচেতন থাকিয়া তাহাকে কোনোমতে খাড়া রাখিতে পারেন। কিন্তু সে কেবল দুই - চারিজন শৌখিনের দ্বারাই সাধ্য।

যাহাকে পালন করিতে, সজীব রাখিতে পারিবে না, তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া পচাইয়া হাওয়া খারাপ করিবার দরকার? ইহাতে পরেরটাও নষ্ট হয়, নিজেরটাও মাটি হইয়া যায়। সমস্ত মাটি করিবার সেই আয়োজন বাংলাদেশেই দেখিতেছি।

তবে কি পরিবর্তন হইবে না। যেখানে যাহা আছে . চিরকাল কি সেখানে তাহা একই ভাবে চলে।

প্রয়োজনের নিয়মে পরিবর্তন হইবে, অনুকরণের নিয়মে নহে। কারণ, অনুকরণ অনেক সময়ই প্রয়োজনবিরুদ্ধ। তাহা সুখশান্তিস্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। চতুর্দিকের অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। তাহাকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়, কষ্ট করিয়া রক্ষা করিতে হয়।

অতএব রেলওয়ে ভ্রমণের জন্য, আপিসে বাহির হইবার জন্য, নূতন প্রয়োজনের জন্য ছাঁটা - কাটা কাপড় বানাইয়া লও। সে তুমি নিজের দেশ, নিজের পরিবেশ, নিজের পূর্বাপরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত করো। সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ ভাববিরুদ্ধ সংগতিবিরুদ্ধ অনুকরণের প্রতি হতবুদ্ধির ন্যায় ধাবিত হইয়ো না।

পুরাতনের পরিবর্তন ও নূতনের নির্মাণে দোষ নাই। আবশ্যকের অনুরোধে তাহা সকল জাতিকেই সর্বদা করিতে হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ অনুকরণ প্রয়োজনের দোহাই দিয়া চলে না। সে প্রয়োজনের দোহাই একটা ছুতামাত্র। কারণ সম্পূর্ণ অনুকরণ কখনোই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। তাহার হয়তো একাংশ কাজের হইতে পারে, অপরাংশ

বাহুল্য। তাহার ছাঁটা কোর্তা হয়তো দৌড়ধাপের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহার ওয়েস্টকোট হয়তো অনাবশ্যক এবং উত্তাপজনক। তাহার টুপিটা হয়তো খপ্ করিয়া মাথায় পরা সহজ হইতে পারে, কিন্তু তাহার টাই - কলার বাঁধিতে অনর্থক সময় দিতে হয়।

যেখানে পরিবর্তন ও নূতন নির্মাণ অসম্ভব ও সাধ্যাতীত সেইখানেই অনুকরণ মার্জনীয় হইতে পারে। বেশভূষায় সে - কথা কোনোক্রমেই খাটে না।

বিশেষত বেশভূষায় কেবলমাত্র অঙ্গাবরণের প্রয়োজন সাধন করে না, তাহাতে ভদ্রাভদ্র, দেশী - বিদেশী, স্বজাতি - বিজাতির পরিচয় দেওয়া হয়। ইংরেজি কাপড়ের ভদ্রতা ইংরেজ জানে। আমাদের ভদ্রলোকদের অধিকাংশের তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। জানিতে গেলেও সর্বদাই ভয়ে ভয়ে পরের মুখ তাকাইতে হয়।

তার পরে স্বজাতি - বিজাতির কথা। কেহ কেহ বলেন, স্বজাতির পরিচয় লুকাইবার জন্যই বিলাতি কাপড়ের প্রয়োজন হয়।

এ কথা বলিতে যাহার লজ্জাবোধ না হয়, তাহাকে লজ্জা দেওয়া কাহারো সাধ্য নহে, পরের বাড়িতে ছদ্মবেশে সম্বন্ধী সাজিয়া গেলে আদর পাওয়া যাইতে পারে, তবু যাহার কিছুমাত্র তেজ ও ভদ্রতাজ্ঞান আছে, সেই আদরকে সে উপেক্ষা করিয়া থাকে। রেলওয়ে ফিরিঙ্গি গার্ড ফিরিঙ্গিভ্রাতা মনে করিয়া যে - আদর করে তাহার প্রলোভন সংবরণ করাই ভালো। কোনো কোনো রেল - লাইনে দেশী - বিলাতির স্বতন্ত্র গাড়ি আছে, কোনো কোনো হোটেলে দেশী লোককে প্রবেশ করিতে দেয় না, সেজন্য রাগিয়া কষ্ট পাইবার অবসর যদি হাতে থাকে তবে সে - কষ্ট স্বীকার করো, কিন্তু জন্ম ভাঁড়াইয়া সেই গাড়িতে বা সেই হোটেলে প্রবেশ করিলে সম্মানের যে কী বৃদ্ধি হয়, তাহা বুঝা কঠিন।

পরিবর্তন কোন্ পর্যন্ত গেলে অনুকরণের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা শক্ত। তবে সাধারণ নিয়মের স্বরূপ একটা কথা বলা যাইতে পারে।

www.bengaliebook.com

যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত বেখাপ হয় না, তাহাকে বলে গ্রহণ করা ; যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত অসামঞ্জস্য হয় তাহাকে বলে অনুকরণ করা।

মোজা পরিলে কোট পরা অনিবার্য হয় না, ধুতির সঙ্গে মোজা বিকল্পে চলিয়া যায় কিন্তু কোটের সঙ্গে ধুতি, অথবা হ্যাটের সঙ্গে চাপকান চলে না। সাধু ইংরেজিভাষার মধ্যেও মাঝে মাঝে ফরাসি, মিশাল চলে, তাহা ইংরেজি - পাঠকেরা জানেন। কিন্তু কী - পর্যন্ত চলিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহার একটা অলিখিত নিয়ম আছে, সে - নিয়ম বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে শেখানো বাহুল্য। তথাপি তার্কিক বলিতে পারে, তুমি যদি অতটা দূরে গেলে, আমি না - হয় আরো কিছুদূর গেলাম, কে আমাকে নিবারণ করিবে। সে তো ঠিক কথা। তোমার রুচি যদি তোমাকে নিবারণ না করে, তবে কাহার পিতৃপুরুষের সাধ্য তোমাকে নিবারণ করিয়া রাখে।

বেশভূষাতেও সেই তর্ক চলে। যিনি আগাগোড়া বিলাতি ধরিয়াছেন তিনি সমালোচককে বলেন, তুমি কেন চাপকানের সঙ্গে প্যান্টলুন পরিয়াছ। অবশেষে তর্কটা ঝগড়ায় গিয়া দাঁড়ায়।

সে স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, যদি অন্যায় হইয়া থাকে, নিন্দা করো, সংশোধন করো, প্যান্টলুনের পরিবর্তে অন্য কোনোপ্রকার পায়জামা যদি কার্যকর ও সুসংগত হয় তবে তাহার প্রবর্তন করো–তাই বলিয়া তুমি আগাগোড়া দেশীবস্ত্র পরিহার করিবে কেন। একজন এক কান কাটিয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি খামকা দুই কান কাটিয়া বসিবে, ইহার বাহাদুরিটা কোথায় বুঝিতে পারি না।

নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে যখন প্রথম পরিবর্তনের আরম্ভ হয়, তখন একটা অনিশ্চয়তার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তখন কে কতদূরে যাইবে তাহার সীমা নির্দিষ্ট থাকে না। কিছুদিনের ঠেলাঠেলির পরে পরস্পর আপসে সীমানা পাকা হইয়া আসে। সেই অনিবার্য অনিশ্চয়তার প্রতি দোষারোপ করিয়া যিনি পুরা নকলের দিকে যান, তিনি অত্যন্ত কুদৃষ্টান্ত দেখান।

কারণ, আলস্য সংক্রামক। পরের তৈরি জিনিসের লোভে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। ভুলিয়া যায়, পরের জিনিস কখনোই আপনার করা যায় না। ভুলিয়া যায়, পরের কাপড় পরিতে হইলে, চিরকালই পরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে।

জড়ত্ব যাহার আরম্ভ, বিকার তাহার পরিণাম। আজ যদি বলি, কে অত ভাবে, তার চেয়ে বিলিতি দোকানে গিয়া একসুট অর্ডার দিয়া আসি– তবে কাল বলিব, প্যান্টলুনটা খাটো হইয়া গেছে, কে এত হাঙ্গাম করে, ইহাতেই কাজ চলিয়া যাইবে।

কাজ চলিয়া যায়। কারণ, বাঙালি - সমাজে বিলাতি কাপড়ের অসংগতির দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। সেইজন্য বিলাতফেরতদের মধ্যেও বিলাতি সাজ সম্বন্ধে ঢিলাভাব দেখা যায় ; সস্তার চেষ্টায় বা আলস্যের গতিকে তাঁহারা অনেকে এমন ভাবে বেশবিন্যাস করেন, যাহা বিধিমত অভদ্র।

কেবল তাহাই নহে। বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্মে বাঙালিভদ্রলোক সাজিয়া আসিতে তাঁহারা অবজ্ঞা করেন, আবার বিলাতি ভদ্রতার নিয়মে নিমন্ত্রণ সাজ পরিয়া আসিতেও আলস্য করেন। পরসজ্জা সম্বন্ধে কোন্‌টা বিহিত, কোন্‌টা অবিহিত, সেটা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিয়া তাঁহারা শিষ্টসমাজের বিধিবিধানের অতীত হইয়া যাইতেছেন। ইংরেজি সমাজে তাঁহারা সামাজিকভাবে চলিতে ফিরিতে পান না। দেশী সমাজকে তাঁহারা সামাজিকভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন–সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত বিধান নিজের বিধান, সুবিধার বিধান ; সে বিধানে আলস্য ঔদাসীন্যকে বাধা দিবার কিছুই নাই। বিলাতের এই - সকল ছাড়া - কাপড় ইহাদের পরপুরুষের গাত্রে কিরূপ বীভৎস হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিলে লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়।

কেবল সাজসজ্জা নহে, আচারব্যবহারে এ - সকল কথা আরো অধিক খাটে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশী প্রথা হইতে যাঁহারা নিজেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের আচারব্যবহারকে সদাচার - সদ্‌ ব্যবহারের সীমামধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে কিসে। যে - ইংরেজের আচার

তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না, দেশী সমাজের ঘনিষ্ঠতা তাঁহারা বলপূর্বক ছেদন করিয়াছেন।

এঞ্জিন কাটিয়া লইলেও গাড়ি খানিকক্ষণ চলিতে পারে, বেগ একেবারে বন্ধ হয় না। বিলাতের ধাক্কা বিলাতফেরতের উপর কিছুদিন থাকিতে পারে, তাহার পরে চলিবে কিসে।

সমাজের হিতার্থে সকল সমাজের মধ্যেই কতকগুলি কঠোর শাসন আপনি অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। যাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে আত্মসমাজের ত্যাজ্যপুত্র, এবং চেষ্টাসত্ত্বেও পরসমাজের পোষ্যপুত্র নহেন, তাঁহারা স্বভাবতই দুই সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিয়া সুখটুকু লইবার চেষ্টা করিবেন। তাহাতে কি মঙ্গল হইবে।

ইহাদের একরকম চলিয়া যাইবে, কিন্তু ইহাদের পুত্রপৌত্রেরা কী করিবে, এবং যাহারা নকলের নকল করে, তাহাদের কী দুরবস্থা হইবে।

দেশী দরিদ্রেরও সমাজ আছে। দরিদ্র হইলেও সে ভদ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু বিলাতি - সাজা দরিদ্রের কোথাও স্থান নাই। বাঙালি - সাহেব কেবলমাত্র ধনসম্পদ ও ক্ষমতার দ্বারা আপনাকে দুর্গতির ঊর্ধ্বে খাড়া রাখিতে পারে। ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট হইবামাত্র সেই সাহেবের পুত্রটি সর্বপ্রকার আশ্রয়হীন অবমাননার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন তাহার ক্ষমতাও নাই, সমাজও নাই। তাহার নূতনলব্ধ পৈতৃক গৌরবেরও চিহ্ন নাই, চিরাগত পৈতামহিক সমাজেরও অবলম্বন নাই। তখন সে কে।

কেবলমাত্র অনুকরণ এবং সুবিধার আকর্ষণে আত্মসমাজ হইতে যাঁহারা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে না, ইহা নিশ্চয়, এবং যে - দুর্বলচিত্তগণ ইঁহাদের অনুকরণে ধাবিত হইবে, তাহারা সর্বপ্রকারে হাস্যজনক হইয়া উঠিবে, ইহাতেও সন্দেহ নাই।

যেটা লজ্জার বিষয়, সেইটে লইয়াই বিশেষরূপে গৌরব অনুভব করিতে বসিলে বন্ধুর কর্তব্য তাহাকে সচেতন করিয়া দেওয়া। যিনি সাহেবের অনুকরণ করিয়াছি মনে করিয়া গর্ববোধ করেন তিনি বস্তুত সাহেবির অনুকরণে করিতেছেন। সাহেবির অনুকরণ সহজ, কারণ তাহা বাহ্যিক জড় অংশ ; সাহেবের অনুকরণ শক্ত, কারণ তাহা আন্তরিক মনুষ্যত্ব। যদি

সাহেবের অনুকরণ করিবার শক্তি তাঁহার থাকিত, তবে সাহেবির অনুকরণ কখনোই করিতেন না। অতএব কেহ যদি শিব গড়িতে গিয়া মাটির গুণে অন্য কিছু গড়িয়া বসেন, তবে সেটা লইয়া লম্ফঝম্ফ না করাই শ্রেয়।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

আমি যখন যুরোপে গেলুম তখন কেবল দেখলুম, জাহাজ চলছে, গাড়ি চলছে, লোক চলছে, দোকান চলছে, থিয়েটার চলছে, পার্লামেন্ট চলছে—সকলেই চলছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল বিষয়েই একটা বিপর্যয় চেষ্টা অহর্নিশি নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে ; মানুষের ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমা পাবার জন্যে সকলে মিলে অশ্রান্তভাবে ধাবিত হচ্ছে।

দেখে আমার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, এবং সেইসঙ্গে বিস্ময় - সহকারে বলে—হাঁ, এরাই রাজার জাত বটে। আমাদের পক্ষে যা যথেষ্টের চেয়ে ঢের বেশি এদের কাছে তা অকিঞ্চন দারিদ্র্য। এদের অতি সামান্য সুবিধাটুকুর জন্যেও, এদের অতি ক্ষণিক আমোদের উদ্দেশেও মানুষের শক্তি আপন পেশী ও স্নায়ু চরম সীমায় আকর্ষণ করে খেটে মরছে।

জাহাজে বসে ভাবতুম এই যে জাহাজটি অহর্নিশি লৌহবক্ষ বিস্ফারিত করে চলেছে, ছাদের উপরে নরনারীগণ কেউ - বা বিশ্রামসুখে, কেউ - বা ক্রীড়াকৌতুকে নিযুক্ত ; কিন্তু এর গোপন জঠরের মধ্যে যেখানে অনন্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, সেখানে অঙ্গারকৃষ্ণ নিরপরাধ নারকীরা প্রতিনিয়তই জীবনকে দগ্ধ করে সংক্ষিপ্ত করছে সেখানে কী অসহ্য চেষ্টা কী দুঃসাধ্য পরিশ্রম, মানবজীবনের কী নির্দয় অপব্যয় অশ্রান্তভাবে চলেছে। কিন্তু কী করা যাবে। আমাদের মানব - রাজা চলেছেন ; কোথাও তিনি থামতে চান না ; অনর্থক কাল নষ্ট কিংবা পথকষ্ট সহ্য করতে তিনি অসম্মত।

তাঁর জন্যে অবিশ্রাম যন্ত্রচালনা করে কেবলমাত্র দীর্ঘ পথকে হ্রাস করাই যথেষ্ট নয় ; তিনি প্রাসাদে যেমন আরামে, যেমন ঐশ্বর্যে থাকেন, পথেও তার তিলমাত্র ত্রুটি চান না। সেবার জন্যে শত শত ভৃত্য অবিরত নিযুক্ত, ভোজনশালা সংগীতমণ্ডপ সুসজ্জিত স্বর্ণচিত্রিত শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত শত বিদ্যুদ্দীপে সমুজ্জ্বল। আহারকালে চর্ব - চোষ্য - লেহ্য - পেয়ের সীমা

নেই। জাহাজ পরিষ্কার রাখবার জন্যে কত নিয়ম কত বন্দোবস্ত ; জাহাজের প্রত্যেক দড়িটুকু যথাস্থানে সুশোভনভাবে গুছিয়ে রাখবার জন্য কত দৃষ্টি।

যেমন জাহাজে, তেমনি পথে ঘাটে দোকানে নাট্যশালার গৃহে সর্বত্রেই আয়োজনের আর অবধি নেই। দশদিকেই মহামহিম মানুষের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ষোড়শোপচারে পূজা হচ্ছে। তিনি মুহূর্তকালের জন্যে যাতে সন্তোষ লাভ করবেন তার জন্যে সংবৎসরকাল চেষ্টা চলছে।

এ - রকম চরমচেষ্টাচালিত সভ্যতাযন্ত্রকে আমাদের অন্তর্মনস্ক দেশীয় স্বভাবে যন্ত্রণা জ্ঞান করত। দেশে যদি একমাত্র যথেচ্ছাচারী বিলাসী রাজা থাকে তবে তার শৌখিনতার আয়োজন করবার জন্যে অনেক অধমকে জীবনপাত করতে হয়, কিন্তু যখন শতসহস্র রাজা তখন মনুষ্যকে নিতান্ত দুর্বহ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। কবিবর Hood- রচিত Song of the Shirt সেই ক্লিষ্ট মানবের বিলাপসংগীত।

খুব সম্ভব দুর্দান্ত রাজার শাসনকালে ইজিপ্টের পিরামিড অনেকগুলি প্রস্তর এবং অনেকগুলি হতভাগ্য মানবজীবন দিয়ে রচিত হয়। এখনকার এই পরম সুন্দর অভ্রভেদী সভ্যতা দেখে মনে হয়, এও উপরে পাষাণ নীচে পাষাণ এবং মাঝখানে মানবজীবন দিয়ে গঠিত হচ্ছে। ব্যাপারটা অসম্ভব প্রকাণ্ড এবং কারুকার্যও অপূর্ব চমৎকার, তেমনি ব্যয়ও নিতান্ত অপরিমিত। সেটা বাহিরে কারো চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসাব জমা হচ্ছে। প্রকৃতির আইন অনুসারে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই। যদি টাকার প্রতি বহু যত্ন করে পয়সার প্রতি নিতান্ত অনাদর করা যায়, তা হলে সেই অনাদৃত তাম্রখণ্ড বহু যত্নের ধন গৌরাঙ্গ টাকাকে ধ্বংস করে ফেলে।

স্মরণ হচ্ছে য়ুরোপের কোনো এক বড়োলোক ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচার করেছেন যে, এক সময়ে কাফ্রিরা য়ুরোপ জয় করবে। আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণ অমাবস্যা এসে য়ুরোপের শুভ্র দিবালোক গ্রাস করবে। প্রার্থনা করি তা না ঘটুক, কিন্তু আশ্চর্য কী। কারণ আলোকের মধ্যে নির্ভয়, তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে রয়েছে, কিন্তু যেখানে অন্ধকার জড়ো হচ্ছে বিপদ সেইখানে বসে গোপনে বলসঞ্চয় করে, সেইখানেই প্রলয়ের তিমিরাবৃত জন্মভূমি।

মানব - নবাবের নবাবি যখন উত্তরোত্তর অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন দারিদ্র্যের অপরিচিত অন্ধকার ঈষান কোণ থেকেই ঝড় ওঠবার সম্ভাবনা।

সেইসঙ্গে আর - একটা কথা মনে হয় ; যদিও বিদেশীয় সমাজ সম্বন্ধে কোনো কথা নিঃসংশয়ে বলা ধৃষ্টতা, কিন্তু বাহির হতে যতটা বোঝা যায় তাতে মনে হয়, য়ুরোপে সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্ছে স্ত্রীলোক ততই অসুখী হচ্ছে।

স্ত্রীলোক সমাজের কেন্দ্রানুগ (centripetal) শক্তি ; সভ্যতার কেন্দ্রাতিগ শক্তি সমাজকে বহির্মুখে যে - পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, কেন্দ্রানুগ শক্তি অন্তরের দিকে সে - পরিমাণে আকর্ষণ করে আনতে পারছে না। পুরুষেরা দেশে বিদেষে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, অভাববৃদ্ধির সঙ্গে নিয়ত জীবিকাসংগ্রামে নিযুক্ত হয়ে রয়েছে। সৈনিক অধিক ভার নিয়ে লড়তে পারে না, পথিক অধিক ভার বহন করে চলতে পারে না, য়ুরোপে পুরুষ পারিবারিক ভার গ্রহণে সহজে সম্মত হয় না। স্ত্রীলোকের রাজত্ব ক্রমশ উজাড় হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। পাত্রের অপেক্ষায় কুমারী দীর্ঘকাল বসে থাকে, স্বামী কার্যোপলক্ষে চলে যায়, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পর হয়ে পড়ে। প্রখর জীবিকাসংগ্রামে স্ত্রীলোকদেরও একাকিনী যোগ দেওয়া আবশ্যক হয়েছে। অথচ তাদের চিরকালের শিক্ষা স্বভাব এবং সমাজনিয়ম তার প্রতিকূলতা করছে।

য়ুরোপে স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারপ্রাপ্তির যে - চেষ্টা করছে সমাজের এই সমাঞ্জস্যনাশই তার কারণ বলে বোধ হয়। নরোয়েদেশীয় প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেন - রচিত কতকগুলি সামাজিক নাটকে দেখা যায়, নাট্যোক্ত অনেক স্ত্রীলোক প্রচলিত সমাজবন্ধনের প্রতি একান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করছে, অথচ পুরুষেরা সমাজপ্রথার অনুকূলে। এইরকম বিপরীত ব্যাপার পড়ে আমার মনে হল, বাস্তবিক, বর্তমান য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থাই নিতান্ত অসংগত। পুরুষেরা না তাদের গৃহপ্রতিষ্ঠা করে দেবে, না তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ণাধিকার দেবে। রাশিয়ার নাইহিলিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে এত স্ত্রীলোকের সংখ্যা দেখে আপাতত

আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু ভেবে দেখলে যুরোপে স্ত্রীলোকের প্রলয়মূর্তি ধরবার অনেকটা সময় এসেছে।

অতএব সবসুদ্ধ দেখা যাচ্ছে, য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্ব বিষয়েই প্রবলতা এমনই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, অসমর্থ পুরুষই বল আর অবলা রমণীই বল, দুর্বলদের আশ্রয়স্থান এ সমাজে যেন ক্রমশই লোপ হয়ে যাচ্ছে। এখন কেবলই কার্য চাই, কেবলই শক্তি চাই, কেবলই গতি চাই ; দয়া দেবার এবং দয়া নেবার, ভালোবাসবার এবং ভালোবাসা পাবার যারা যোগ্য তাদের এখানে যেন সম্পূর্ণ অধিকার নেই। এইজন্যে স্ত্রীলোকেরা যেন তাদের স্ত্রীস্বভাবের জন্যে লজ্জিত। তারা বিধিমতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে যে, আমাদের কেবল যে হৃদয় আছে তা নয়, আমাদের বলও আছে। অতএব ' আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে' । হায়, আমরা ইংরেজ - শাসিত বাঙালিরাও সেইভাবেই বলছি, ' নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে। '

এই তো অবস্থা। কিন্তু ইতিমধ্যে যখন ইংলণ্ডে আমাদের স্ত্রীলোকদের দুরবস্থার উল্লেখ করে মুষলধারায় অশ্রুবর্ষণ হয়, তখন এতটা অজস্র করুণা বৃথা নষ্ট হচ্ছে বলে মনে অত্যন্ত আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ইংরেজের মুল্লুকে আমরা অনেক আইন এবং অনেক আদালত পেয়েছি। দেশে যত চোর আছে পাহারাওয়ালার সংখ্যা তার চেয়ে ঢের বেশি। সুনিয়ম সুশৃঙ্খল সম্বন্ধে কথাটি কবার জো নেই। ইংরেজ আমাদের সমস্ত দেশটিকে ঝেড়ে ঝেড়ে ধুয়ে নিঙড়ে ভাঁজ করে পাট করে ইস্ত্রি করে নিজের বাক্সর মধ্যে পুরে তার উপর জগদ্দল হয়ে চেপে বসে আছে। আমরা ইংরেজের সতর্কতা, সচেষ্টতা, প্রখর বুদ্ধি, সুশৃঙ্খল কর্মপটুতার অনেক পরিচয় পেয়ে থাকি ; যদি কোনো কিছুর অভাব অনুভব করি তবে সে এই স্বর্গীয় করুণার, নিরুপায়ের প্রতি ক্ষমতাশালীর এমন অবস্থায় আমাদের সমাজের ভালো হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে, সে কথা এখানে বিচার্য নয়, সে কথা নিয়ে অনেক বাদ - প্রতিবাদ হয়ে গেছে। এখানে কথা হচ্ছিল, আমাদের স্ত্রীলোকেরা সুখী কি অসুখী। আমার মনে হয় আমাদের সমাজের যেরকম গঠন, তাতে সমাজের ভালোমন্দ যা - ই হোক আমাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ একরকম সুখে আছে।

ইংরেজেরা মনে করতে পারেন লনটেনিস না খেললে এবং 'বলে' না নাচলে স্ত্রীলোক সুখী হয় না, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, ভালোবেসে এবং ভালোবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ। তবে সেটা একটা কুসংস্কার হতেও পারে।

আমাদের পরিবারে নারীহৃদয় যেমন বিচিত্রভাবে চরিতার্থতা লাভ করে এমন ইংরেজ - পরিবারে অসম্ভব। এইজন্যে একজন ইংরেজ - মেয়ের পক্ষে চিরকুমারী হওয়া দারুণ দুরদৃষ্টতা। তাদের শূন্যহৃদয় ক্রমশ নীরস হয়ে আসে কেবল কুকুরশাবক পালন করে এবং সাধারণ - হিতার্থে সভা পোষণ করে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করে। যেমন মৃতবৎসা প্রসূতির সঞ্চিত স্তন্য কৃত্রিম উপায়ে নিষ্ক্রান্ত করে দেওয়া তার স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক, তেমনি য়ুরোপীয় চিরকুমারীর নারীহৃদয়সঞ্চিত স্নেহরস নানা কৌশলে নিষ্ফল ব্যয় করতে হয়, কিন্তু তাতে তাদের আত্মার প্রকৃত পরিতৃপ্তি হতে পারে না।

ইংরেজ □□□ □□□□- এর সঙ্গে আমাদের বালবিধবার তুলনা বোধ হয় অন্যায় হয় না। সংখ্যায় বোধ করি ইংরেজ কুমারী এবং আমাদের বালবিধবা সমান হবে কিংবা কিছু যদি কমবেশি হয়। বাহ্য সাদৃশ্যে আমাদের বিধবা য়ুরোপীয় চিরকুমারীর সমান হলেও প্রধান একটা বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের বিধবা নারীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনো শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনো অকর্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না। তিনি কখনো জননী কখনো দুহিতা কখনো সখী। এইজন্যে চিরজীবনই তিনি কোমল সরস স্নেহশীল সেবাতৎপর হয়ে থাকেন। বাড়ির শিশুরা তাঁরই চোখের সামনে জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁরই কোলে কোলে বেড়ে ওঠে। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁর বহুকালের সুখদুঃখময় প্রীতির সখিত্ববন্ধন, বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে স্নেহভক্তিপরিহাসের বিচিত্র সম্বন্ধ ; গৃহকার্যের ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালোবাসে তাও তাঁর অভাব নেই। এবং ওরই মধ্যে রামায়ণ মহাভারত দুটো - একটা পুরাণ পড়বার কিংবা শোনবার সময় থাকে, এবং সন্ধ্যাবেলায় ছোটো ছোটো ছেলেদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে উপকথা বলাও একটা স্নেহের কাজ বটে। বরং একজন বিবাহিত রমণীর বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি

এবং অবসর থাকে, কিন্তু বিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোণটুকুও উদ্‌বৃত্ত থাকতে প্রায় দেখা যায় না।

এই - সকল কারণে, তোমাদের যে - সকল মেয়ে প্রমোদের আবর্তে অহর্নিশি ঘূর্ণ্যমান কিংবা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত, কিংবা দুটো - একটা কুকুরশাবক এবং চারটে - পাঁচটা সভা কোলে করে একাকিনী কৌমার্য কিংবা বৈধব্য যাপনে নিরত, তাঁদের চেয়ে যে আমাদের অন্তঃপুরচারিণীরা অসুখী, এ কথা আমার মনে লয় না। ভালোবাসহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক, মরুভূমির মধ্যে অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা গৃহীলোকের পক্ষে যেমন ভীষণ শূন্‌য।

আমরা আর যা - ই হই, আমরা গৃহস্থ জাতি। অতএব বিচার করে দেখতে গেলে, আমরা আমাদের রমণীদের দ্বারেই অতিথি ; তাঁরাই আমাদের সর্বদা বহু যত্ন আদর করে রেখে দিয়েছেন। এমনই আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন যে, আমরা ঘর ছেড়ে দেশ ছেড়ে দু'দিন টিঁকতে পারি নে ; তাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে করে নারীরা অসুখী হয় না।

আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে কিছুই করবার নেই, আমাদের সমাজ যে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বসম্পূর্ণ এবং আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা তার একটা প্রমাণ, এ কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। আমাদের রমণীদের শিক্ষার অঙ্গহীনতা আছে এবং অনেক বিষয়ে তাদের শরীরমনের সুখসাধন করাকে আমরা উপেক্ষা এবং উপহাসযোগ্য জ্ঞান করি। এমন - কি, রমণীদের গাড়িতে চড়িয়ে স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবন করানোকে আমাদের দেশের পরিহাসরসিকেরা একটা পরম হাস্যরসের বিষয় বলে স্থির করেন ; কিন্তু তবুও মোটের উপর বলা যায়, আমাদের স্ত্রীকন্যারা সর্বদাই বিভীষিকারাজ্যে বাস করছেন না এবং তাঁরা সুখী।

তাঁদের মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে এই প্রশ্ন ওঠে, আমরা পুরুষেরাই কি খুব বেশি শিক্ষিত। আমরা কি একরকম কাঁচা - পাকা জোড়া - তাড়া অদ্ভুত ব্যাপার নই। আমাদের কি পর্যবেক্ষণশক্তির, বিচারশক্তি এবং ধারণাশক্তির

বেশ সুস্থ সহজ এবং উদার পরিণতি লাভ হয়েছে। আমরা কি সর্বদাই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অপ্রকৃত কল্পনাকে মিশ্রিত করে ফেলি নে, এবং অন্ধসংস্কার কি আমাদের যুক্তিরাজ্যসিংহাসনের অর্ধেক অধিকার করে সর্বদাই অটল এবং দাম্ভিকভাবে বসে থাকে না। আমাদের এইরকম দুর্বল শিক্ষা এবং দুর্বল চরিত্রের জন্য সর্বদাই কি আমাদের বিশ্বাস এবং কার্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত অসংগতি দেখা যায় না। আমাদের বাঙালিদের চিন্তা এবং মত এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে কি একপ্রকার শৃঙ্খলাসংযমবিহীন বিষম বিজড়িত ভাব লক্ষিত হয় না।

আমরা সুশিক্ষিতভাবে দেখতে শিখি নি, ভাবতে শিখি নি, কাজ করতে শিখি নি, সেইজন্যে আমাদের কিছুর মধ্যেই স্থিরত্ব নেই—আমরা যা বলি যা করি সমস্ত খেলার মতো মনে হয়, সমস্ত অকাল মুকুলের মতো ঝরে গিয়ে মাটি হয়ে যায়। সেইজন্য আমাদের রচনা ডিবেটিং ক্লাবের ‘এসে'র মতো, আমাদের মতামত সূক্ষ্ম তর্কচাতুরী প্রকাশের জন্যে, জীবনের ব্যবহারের জন্যে নয়, আমাদের বুদ্ধি কুশাঙ্কুরের মতো তীক্ষ্ম কিন্তু তাতে অস্ত্রের বল নেই। আমাদেরই যদি এই দশা তো আমাদের স্ত্রীলোকদের কতই বা শিক্ষা হবে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই সমাজের যে - অন্তরের স্থান অধিকার করে থাকেন সেখানে পাক ধরতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। য়ুরোপের স্ত্রীলোকদের অবস্থা আলোচনা করলেও তাই দেখা যায়। অতএব আমাদের পুরুষদের শিক্ষার বিকাশলাভের পূর্বেই যদি আমাদের অধিকাংশ নারীদের শিক্ষার সম্পূর্ণতা প্রত্যাশা করি তা হলে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার প্রয়াস প্রকাশ পায়।

তবে এ কথা বলতেই হয় ইংরেজ স্ত্রীলোক অশিক্ষিত থাকলে যতটা অসম্পূর্ণ - স্বভাব থাকে আমাদের পরিপূর্ণ গৃহের প্রসাদে আমাদের রমণীর জীবনের শিক্ষা সহজেই তার চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করে।

কিন্তু এই বিপুল গৃহের ভারে আমাদের জাতির আর বৃদ্ধি হতেই পেলে না। গার্হস্থ্য উত্তরোত্তর এমনই অসম্ভব প্রকাণ্ড হয়ে পড়েছে যে, নিজ গৃহের বাহিরের জন্যে আর কারো কোনো শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। অনেকগুলায় একত্রে জড়ীভূত হয়ে সকলকেই সমান খর্ব করে রেখে দেয়। সমাজটা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট একটা জঙ্গলের মতো হয়ে যায়, তার সহস্র বাধাবন্ধনের মধ্যে কোনো - একজনেক মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠা বিষম শক্ত হয়ে পড়ে।

সূচিপত্র

এই ঘনিষ্ঠ পরিবারের বন্ধনপাশে পড়ে এ দেশে জাতি হয় না, দেশ হয় না, বিশ্ববিজয়ী মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায় না। পিতামাতা হয়েছে, পুত্র হয়েছে, ভাই হয়েছে, স্ত্রী হয়েছে এবং এই নিবিড় সমাজশক্তির প্রতিক্রিয়াবশে অনেক বৈরাগী সন্ন্যাসীও হয়েছে কিন্তু বৃহৎ সংসারের জন্যে কেউ জন্মে নি—পরিবারকেই আমরা সংসার বলে থাকি।

কিন্তু য়ুরোপে আবার আর - এক কাণ্ড দেখা যাচ্ছে। য়ু রোপীয়ের গৃহবন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল বলে তাঁদের মধ্যে অনেকে যেমন সমস্ত ক্ষমতা স্বজাতি কিংবা মানবহিতব্রতে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন তেমনি আর - এক দিকে অনেকেই সংসারের মধ্যে কেবলমাত্র নিজেকেই লালন পালন পোষণ করবার সুদীর্ঘ অবসর এবং সুযোগ পাচ্ছেন ; এক দিকে যেমন বন্ধনহীন পরহিতৈষা আর - এক দিকেও তেমনি বাধাবিহীন স্বার্থপরতা। আমাদের যেমন প্রতিবৎসর পরিবার বাড়ছে, ওদের তেমনি প্রতিবৎসর আরাম বাড়ছে। আমরা বলি যাবৎ দারপরিগ্রহ না হয় তাবৎ পুরুষ অর্ধেক, ইংরেজ বলে যতদিন একটি ক্লাব না জোটে ততদিন পুরুষ অর্ধাঙ্গ ; আমরা বলি সন্তানে গৃহ পরিবৃত না হলে গৃহ শ্মশানসমান, ইংরেজ বলেন আসবাব অভাবে গৃহ শ্মশানতুল্য।

সমাজে একবার যদি এই বাহ্যসম্পদকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে সে এমনই প্রভু হয়ে বসে যে, তার হাত আর সহজে এড়াবার জো থাকে না। তবে ক্রমে সে গুণের প্রতি অবজ্ঞা এবং মহত্ত্বের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করতে আরম্ভ করে।

সম্প্রতি এ দেশেও তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ডাক্তারিতে যদি কেহ পসার করতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর সর্বাগ্রেই জুড়ি গাড়ি এবং বড়ো বাড়ির আবশ্যক ; এইজন্যে অনেক সময়ে রোগীকে মারতে আরম্ভ করবার পূর্বে নবীন ডাক্তার নিজে মরতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের কবিরাজ মহাশয় যদি চটি এবং চাদর পরে পালকি অবলম্বনপূর্বক যাতায়াত করেন তাতে তাঁর পসারের ব্যাঘাত করে না। কিন্তু একবার যদি গাড়ি ঘোড়া ঘড়ি ঘড়ির - চেনকে আমল দেওয়া হয় তবে সমস্ত চরক - সুশ্রুত - ধন্বন্তরীর সাধ্য নেই যে, আর তার হাত থেকে পরিত্রাণ করে। ইন্দ্রিয়সুত্রে জড়ের সঙ্গে মানুষের একটা ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা আছে, সেই সুযোগে সে সর্বদাই আমাদের কর্তা হয়ে উঠে। এইজন্যে প্রতিমা

প্রথমে ছল করে মন্দিরে প্রবেশ করে তার পরে দেবতাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। গুণের বাহ্য নিদর্শনস্বরূপ হয়ে ঐশ্বর্য দেখা দেয়, অবশেষে বাহ্যাড়ম্বরের অনুবর্তী হয়ে না এলে গুণের আর সম্মান থাকে না।

বেগবতী মহা নদী নিজে বালুকা সংগ্রহ করে এনে অবশেষে নিজের পথরোধ করে বসে। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সেইরকম প্রবল নদী বলে এক - একবার মনে হয়। তার বেগের বলে, মানুষের পক্ষে যা সামান্য আবশ্যক এমন - সকল বস্তুও চতুর্দিক থেকে আনীত হয়ে রাশীকৃত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সভ্যতার প্রতি বর্ষের আবর্জনা পর্বতাকার হয়ে উঠছে। আর আমাদের সংকীর্ণ নদীটি নিতান্ত ক্ষীণস্রোত ধারণ করে অবশেষে মধ্যপথে পারিবারিক ঘনশৈবালজালের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে আচ্ছন্নপ্রায় হয়ে গেছে। কিন্তু তারও একটি শোভা সরসতা শ্যামলতা আছে। তার মধ্যে বেগ নেই, বল নেই, ব্যাপ্তি নেই, কিন্তু মৃদুতা স্নিগ্ধতা সহিষ্ণুতা আছে।

আর, যদি আমার আশঙ্কা সত্য হয়, তবে য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়তো - বা তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করছে ; গৃহ, যা মানুষের স্নেহপ্রেমের নিভৃত নিকেতন, কল্যাণের চিরউৎসভূমি, পৃথিবীর আর - সমস্তই লুপ্ত হয়ে গেলেও যেখানে একটুখানি স্থান থাকা মানুষের পক্ষে চরম আবশ্যক, স্তূপাকার বাহ্যবস্তুর দ্বারা সেইখানটা উত্তরোত্তর ভরাট করে ফেলছে, হৃদয়ের জন্মভূমি জড় আবরণে কঠিন হয়ে উঠছে।

নতুবা যে - সভ্যতা পরিবারবন্ধনের অনুকূল, সে - সভ্যতার মধ্যে কি নাইহিলিজ্‌ম - নামক অতবড়ো একটা সর্বসংহারক হিংস্র প্রবৃত্তির জন্মলাভ সম্ভব হয়। সোশ্যালিজ্‌ম কি কখনো পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী পুত্রকলত্রের মধ্যে এসে পড়ে নখদন্ত বিকাশ করতে পারে। যখন কেবল আপনার সম্পদের বোঝাটি আপনার মাথায় তুলে নিয়ে গৃহত্যাগী স্বার্থবাহী সংসারপথ দিয়ে একলা চলে তখনই সন্ধ্যাবেলায় এই শ্বাপদগুলো এক লম্ফে স্কন্ধে এসে পড়বার সুযোগ অন্বেষণ করে।

যা হোক, আমার মতো অভাজন লোকের পক্ষে য়ুরোপীয় সভ্যতার পরিণাম অন্বেষণের চেষ্টা অনেকটা দার ব্যাপারীর জাহাজের তত্ত্ব নেওয়ার মতো হয়। তবে একটা নির্ভয়ের কথা এই যে, আমি যে - কোনো অনুমানই ব্যক্ত করি না কেন, তার সত্য মিথ্যা পরীক্ষার এত বিলম্ব আছে যে, ততদিনে আমি এখানকার দণ্ড - পুরস্কারের হাত এড়িয়ে বিস্মৃতিরাজ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করব। অতএব এ - সকল

www.bengaliebook.com

কথা যিনি যে - ভাবেই নিন আমি তার জবাবদিহি করতে চাই না। কিন্তু য়ুরোপের স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে - কথাটা বলছিলুম সেটা নিতান্ত অবজ্ঞার যোগ্য বলে আমার বোধ হয় না।

যে - দেশে গৃহ নষ্ট হয়ে ক্রমে হোটেল বৃদ্ধি হচ্ছে ; যে - যার নিজে নিজে উপার্জন করছে এবং আপনার ঘরটি, □□□□ □□□□□- টি, কুকুরটি, ঘোড়াটি, বন্দুকটি, চুরুটের পাইপটি, এবং জুয়াখেলার ক্লাবটি নিয়ে নির্বিঘ্নে আরামের চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে সেখানে নিশ্চয়ই মেয়েদের মৌচাক ভেঙে গেছে। পূর্বে সেবক - মক্ষিকারা মধু অন্বেষণ করে চাকে সঞ্চয় করত এবং রাজ্ঞী - মক্ষিকারা কর্তৃত্ব করতেন, এখন স্বার্থপরগণ যে - যার নিজের নিজের চাক ভাড়া করে সকালে মধু উপার্জনপূর্বক সন্ধ্যা পর্যন্ত একাকী নিঃশেষে উপভোগ করছে। সুতরাং রানী - মক্ষিকাদের এখন বেরোতে হচ্ছে, কেবলমাত্র মধুদান এবং মধুপান করবার আর সময় নেই। বর্তমান অবস্থা এখনো তাদের স্বাভাবিক হয়ে যায়নি ; এইজন্যে অনেকটা পরিমাণে অসহায়ভাবে তাঁরা ইতস্তত ভন্ ভন্ করে বেড়াচ্ছেন। আমরা আমাদের মহারানীদের রাজত্বে বেশ আছি এহং তাঁরাও আমাদের অন্তঃপুর অর্থাৎ আমাদের পারিবারিক সমাজের মর্মস্থানটি অধিকার করে সকল কটিকে নিয়ে বেশ সুখে আছেন।

কিন্তু সম্প্রতি সমাজের নানা বিষয়ে অবস্থান্তর ঘটছে। দেশের আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতই ভিন্ন আকার ধারণ করছে এবং সেই সূত্রে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মতো বোধ হচ্ছে। সেইসঙ্গে ক্রমশ আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থাপরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চলবে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে।

অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হলে বর্তমান শিক্ষিতসমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে, ইংরেজি যে জানে এবং ইংরেজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মতো দাঁড়াচ্ছে,

www.bengaliebook.com

অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে। একজনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর - একজনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন। এইজন্যে আমাদের আধুনিক দাম্পত্যে অনেক প্রহসন এবং সম্ভবত অনেক ট্র্যাজেডিও ঘটে থাকে। স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডাওয়াটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে উপস্থিত করে।

এইজন্যে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশই প্রচলিত হচ্ছে ; কারো বক্তৃতায় নয়, কর্তব্যজ্ঞানে নয়, আবশ্যকের বশে।

এখন, অন্তরে বাহিরে এ ইংরেজি শিক্ষা প্রবেশ করে সমাজের অনেক ভাবান্তর উপস্থিত করবেই সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা আশঙ্কা করেন আমরা এই শিক্ষার প্রভাবে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রাচ্যলীলা সংবরণ করে পরম পাশ্চাত্যলোক লাভ করব, আমার আশা এবং আমার বিশ্বাস তাঁদের সে আশঙ্কা ব্যর্থ হবে।

কারণ, যেমন শিক্ষাই পাই - না কেন, আমাদের একেবারে রূপান্তর হওয়া অসম্ভব। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের কেবল কতকগুলি ভাব এনে দিতে পারে কিন্তু তার সমস্ত অনুকূল অবস্থা এনে দিতে পারে না। ইংরেজি সাহিত্য পেতে পারি কিন্তু ইংলণ্ড পাব কোথা থেকে। বীজ পাওয়া যায় কিন্তু মাটি পাওয়াই কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখানো যেতে পারে, বাইবেল যদিও বহুকাল হতে য়ুরোপের প্রধান শিক্ষার গ্রন্থ, তথাপি য়ুরোপ আপন অসহিষ্ণু দুর্দান্ত ভাব রক্ষা করে এসেছে, বাইবেলের ক্ষমা এবং নম্রতা এখনো তাদের অন্তরকে গলাতে পারে নি।

আমার তো বোধ হয় য়ুরোপের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই, য়ুরোপের বাল্যকাল হতে এমন - একটি শিক্ষা পাচ্ছে যা তার প্রকৃতির সম্পুর্ণ অনুযায়ী নয়, যা তার সহজ স্বভাবের কাছে নূতন অধিকার এনে দিচ্ছে, এবং সর্বদা সংঘাতের দ্বারা তাকে মহত্ত্বের পথে জাগ্রত করে রাখছে।

য়ুরোপ কেবল যদি নিজের প্রকৃতি - অনুসারিণী শিক্ষা লাভ করত তা হলে য়ুরোপের আজ এমন উন্নতি হত না। তা হলে য়ুরোপের সভ্যতার মধ্যে এমন ব্যাপ্তি থাকত না, তা হলে একই উদারক্ষেত্রে এত ধর্মবীর এবং কর্মবীরের অভ্যুদয় হত না। খৃষ্টধর্ম সর্বদাই য়ুরোপের স্বর্গ এবং মর্ত, মন এবং আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে রেখেছে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

খৃষ্টীয় শিক্ষা কেবল যে তলে তলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে আধ্যাত্মিক রসের সঞ্চার করছে তা নয়, তার মানসিক বিকাশের কত সহায়তা করেছে বলা যায় না। য়ুরোপের সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাইবলসহযোগে প্রাচ্যভাব প্রাচ্যকল্পনা য়ুরোপের হৃদয়ে স্থান লাভ করে সেখানে কত কবিত্ব কত সৌন্দর্য বিকাশ করেছে ; উপদেশের দ্বারায় নয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবের দ্বারায় তার হৃদয়ের সার্বজনীন অধিকার যে কত বিস্তৃত করেছে তা আজ কে বিশ্লেষ করে দেখাতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে - শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছি তাও আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগত নয়। এইজন্যে আশা করছি এই নূতন শক্তির সমাগমে আমাদের বহুকালের একভাবাপন্ন জড়ত্ব পরিহার করতে পারব, নব জীবনহিল্লোলের স্পর্শে সজীবতা লাভ করে পুনরায় নবপত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠব, আমাদের মানসিক রাজ্য সুদুরবিস্তৃতি লাভ করতে পারবে।

কেহ কেহ বলেন, য়ুরোপের ভালো য়ুরোপের পক্ষেই ভালো, আমাদের ভালো আমাদেরই ভালো। কিন্তু কোনোপ্রকার ভালো কখনোই পরস্পরের প্রতিযোগী নয় তাহা সহযোগী। অবস্থাবশত আমরা কেহ একটাকে কেহ আর - একটাকে প্রাধান্য দিই, কিন্তু মানবের সর্বাঙ্গীণ হিতের প্রতি দৃষ্টি করলে কাউকেই দূর করে দেওয়া যায় না। এমন - কি, সকল ভালোর মধ্যেই এমন - একটি পারিবারিক বন্ধন আছে যে, একজনকে দূর করলেই আর - একজন দুর্বল হয় এবং অঙ্গহীন মনুষ্যত্ব ক্রমশ আপনার গতি বন্ধ করে সংসারপথপার্শ্বে একস্থানে স্থিতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয় এবং এই নিরুপায় স্থিতিকেই উন্নতির চূড়ান্ত পরিণাম বলে আপনাকে ভোলাতে চেষ্টা করে।

গাছ যদি সহসা বুদ্ধিমান কিংবা অত্যন্ত সহৃদয় হয়ে ওঠে তা হলে সে মনে মনে এমন তর্ক করতে পারে যে, মাটিই আমার জন্মস্থান অতএব কেবল মাটির রস আকর্ষণ করেই আমি বাঁচব। আকাশের রৌদ্রবৃষ্টি আমাকে ভুলিয়ে আমার মাতৃভুমি থেকে আমাকে ক্রমশই আকাশের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, অতএব আমরা নব্যতরুসম্প্রদায়েরা একটা সভা করে এই সততচঞ্চল পরিবর্তনশীল

www.bengaliebook.com

রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুর সংস্পর্শ বহুপ্রযত্নে পরিহার - পূর্বক আমাদের ধ্রুব অটল সনাতন ভুমির একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করব।

কিংবা সে এমন তর্কও করতে পারে যে, ভূমিটা অত্যন্ত স্থূল, হেয় এবং নিম্নবর্তী, অতএব তার সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা না রেখে আমি চাতক পক্ষীর মতো কেবল মেঘের মুখ চেয়ে থাকব—দুয়েতেই প্রকাশ পায় বৃক্ষের পক্ষে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে তার অনেক অধিক বুদ্ধির সঞ্চার হয়েছে।

তেমনি বর্তমান কালে যাঁরা বলেন, আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বাহিরের শিক্ষা হতে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে বসে থাকব, কিংবা যাঁরা বলেন, হঠাৎ - শিক্ষার বলে আমরা আতশবাজির মতো এক মুহূর্তে ভারতভূতল পরিত্যাগ করে সুদূর উন্নতির জ্যোতিষ্কলোকে গিয়ে হাজির হব তাঁরা উভয়েই অনাবশ্যক কল্পনা নিয়ে অতিরিক্ত বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ করছেন।

কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে স্বভাবতই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ থেকে শিকড় উৎপাটন করেও আমরা বাঁচব না এবং যে - ইংরেজিশিক্ষা আমাদের চতুর্দিকে নানা আকারে বর্ষিত ও প্রবাহিত হচ্ছে তাও আমাদের শিরোধার্য করে নিতে হবে। মধ্যে মধ্যে দুটো একটা বজ্রও পড়তে পারে এবং কেবলই যে বৃষ্টি হবে তা নয়, কখনো কখনো শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিমুখ হয়ে যাব কোথায়। তা ছাড়া এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য, এই যে নূতন বর্ষার বারিধারা এতে আমাদের সেই প্রাচীন ভূমির মধ্যেই নবজীবন সঞ্চার করছে।

অতএব ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের কী হবে। আমরা ইংরেজ হব না, কিন্তু আমরা সবল হব উন্নত হব জীবন্ত হব। মোটের উপরে আমরা এই গৃহপ্রিয় শান্তিপ্রিয় জাতিই থাকব, তবে এখন যেমন “ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ” তেমনটা থাকবে না। আমাদের বাহিরেও বিশ্ব আছে সে বিষয়ে আমাদের চেতনা হবে। আপনার সঙ্গে পরের তুলনা করে নিজের যদি কোনো বিষয়ে অনভিজ্ঞ গ্রাম্যতা কিংবা অতিমাত্র বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটা অদ্ভুত হাস্যকর অথবা দূষণীয় বলে ত্যাগ করতে পারব। আমাদের বহুকালের রুদ্ধ বাতায়নগুলো খুলে দিয়ে বাহিরের বাতাস এবং পূর্ব - পশ্চিমের দিবালোক ঘরের মধ্যে আনয়ন করতে পারব। যে - সকল নির্জীব সংস্কার আমাদের গৃহের বায়ু দূষিত করছে কিংবা গতিবিধির বাধারূপে পদে পদে স্থানাবরোধ করে পড়ে আছে, তাদের মধ্যে আমাদের চিন্তার

বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে কতকগুলিকে দগ্ধ এবং কতকগুলিকে পুনর্জীবিত করে দেবে। আমরা প্রধানত সৈনিক, বণিক অথবা পথিক - জাতি না হতেও পারি কিন্তু আমরা সুশিক্ষিত পরিণতবুদ্ধি সহৃদয় উদারস্বভাব মানবহিতৈষী ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ হয়ে উঠতে পারি এবং বিস্তর অর্থ - সামর্থ্য না থাকলেও সদাসচেষ্ট জ্ঞান প্রেমের দ্বারা সাধারণ মানবের যথেষ্ট সাহায্য করতেও পারি।

অনেকের কাছে এ - আইডিয়ালটা আশানুরূপ উচ্চ না মনে হতেও পারে কিন্তু আমার কাছে এটা বেশ সংগত বোধ হয়। এমন - কি, আমার মনে হয় পালোয়ান হওয়া আইডিয়াল নয়, সুস্থ হওয়াই আইডিয়াল। অভ্রভেদী মন্যুমেন্ট কিংবা পিরামিড আইডিয়াল নয়, বায়ু ও আলোকগম্য বাসযোগ্য সুদৃঢ় গৃহই আইডিয়াল।

একটা জ্যামিতির রেখা যতই দীর্ঘ এবং উন্নত করে তোলা যায় তাকে আকৃতির উচ্চ আদর্শ বলা যায় না। তেমনি মানবের বিচিত্র বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্যরহিত একটা হঠাৎ গগনস্পর্শী বিশেষত্বকে মনুষ্যত্বের আইডিয়াল বলা যায় না। আমাদের অন্তর এবং বাহিরের সম্যক স্ফূর্তি সাধন করে আমাদের বিশেষ ক্ষমতাকে সুস্থ সুন্দরভাবে সাধারণ প্রকৃতির অঙ্গীভূত করে দেওয়াই আমাদের যথার্থ সুপরিণতি।

আমরা গৃহকোণে বসে রুদ্র আর্যতেজে সমস্ত সংসারকে আপন মনে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করে দিয়ে, মানবজাতির পনেরো আনা উনিশ গণ্ডা দুই পাইকে একঘরে করে কল্পনা করি পৃথিবীর মধ্যে আমরা আধ্যাত্মিক ; পৃথিবীতে আমাদের পদধূলি এবং চরণামৃত বিক্রয় করে চিরকাল আমরা অপরিমিত স্ফীতিভাব রক্ষা করতে পারব। অথচ সেটা আছে কি না আছে ঠিক জানি নে ; এবং যদি থাকে তো কোন্ সবল ভিত্তি অধিকার করে আছে তাও বলতে পারি নে ; আমাদের সুশিক্ষিত উদার মহৎ হৃদয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে, না শাস্ত্রের শ্লোকরাশির মধ্যে নিহিত হয়ে আছে তাও বিবেচনা করে দেখি নে, সকলে মিলে চোখ বুজে নিশ্চিন্ত মনে স্থির করে রেখে দিই কোথাও - না কোথাও আছে, নিজের অন্তরের মধ্যেই হোক, আর তুলটের পুঁথির মধ্যেই হোক, বর্তমানের মধ্যেই হোক আর অতীতের মধ্যেই হোক, অর্থাৎ আছেই হোক আর ছিলই হোক, ও একই কথা।

ধনীর ছেলে যেমন মনে করে আমি ধনী অতএব আমার বিদ্বান হবার কোনো আবশ্যক নেই, এমন - কি, চাকরি - পিপাসুদের মতো কলেজে পাস দেওয়া আমার বংশ - মর্যাদার হানিজনক তেমনি আমাদের শ্রেষ্ঠতাভিমানীরা মনে করেন পৃথিবীর মধ্যে আমরা বিশেষ কারণে বিশেষ বড়ো, অতএব আমাদের আর - কিছু না করলেও চলে এমন - কি, কিছু না করাই কর্তব্য।

এ দিকে হয়তো আমার পৈতৃক ধন সমস্ত উড়িয়ে বসে আছি। ব্যাঙ্কে আমার যা ছিল হয়তো তার কানাকড়ি অবশিষ্ট নেই কেবল এই কীটদষ্ট চেকবইটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। যখন কেহ দরিদ্র আপবাদ দেয় তখন প্রাচীন লোহার সিন্দুক থেকে ঐ বইটা টেনে নিয়ে তাতে বড়ো বড়ো অঙ্কপাতপূর্বক খুব সতেজে নাম সই করতে থাকি। শত সহস্র লক্ষ কোটি কলমে কিছুই বাধে না। কিন্তু যথার্থ তেজস্বী লোকে এ ছেলেখেলার চেয়ে মজুরি করে সামান্য উপার্জনও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।

অতএব আপাতত আমাদের কোনো বিশেষ মহত্ত্বে কাজ নেই। আমরা যে - ইংরেজি শিক্ষা পাচ্ছি সেই শিক্ষা দ্বারা আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা দূর করে আমরা যদি পুরা প্রমাণসই একটা মানুষের মতো হতে পারি তা হলেই যথেষ্ট। তার পরে যদি সৈন্য হয়ে রাঙা কুর্তি পরে চতুর্দিকে লড়াই করে করে বেড়াই কিংবা আধ্যত্মিক হয়ে ঠিক ভ্রূর মধ্যবিন্দুতে কিংবা নাসিকার অগ্রভাগে অহর্নিশি আপনাকে নিবিষ্ট করে রেখে দিই সে পরের কথা।

আশা করি আমরা নানা ভ্রম এবং নানা আঘাত - প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকেই যাচ্ছি। এখনো আমরা দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে দোদুল্যমান ; তাই উভয় পক্ষের সত্যকেই অনিশ্চিত ছায়ার মতো অস্পষ্ট দেখাচ্ছে ; কেবল মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য মধ্য আশ্রয়টি উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের পক্ষে একটা স্থির আশা - ভরসা জন্মে। আমার এই অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ রচনায় পর্যায়ক্রমে সেই আশা ও আশঙ্কার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

www.bengaliebook.com

অযোগ্য ভক্তি

ইষ্টি আর পুরোহিত
যাহা হতে সর্বস্থিত
তারা যদি আসে বাড়ি পরে,
শুধু হাতে প্রণামেতে
ভার হয়ে যান তাতে
মুখে হাসি অন্তরে বেজার।
তিনটাকা নগদে দিলে
চরণ তুলি মাথা পরে
প্রসন্ন বদনে দেন বর।

উল্লিখিত শ্লোক তিনটি টাকা সম্বন্ধীয় একটি ছড়া হইতে উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম। ইহার ছন্দ মিল এবং কবিত্ব সম্বন্ধে আমি কোনো জবাবদিহি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই।

কেবল দেখিবার বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে যে - সত্যটুকু বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তাহা সর্ববাদিসম্মত।

টাকার যে কী আশ্চর্য ক্ষমতা তাহারই অনেকগুলি দৃষ্টান্তের মধ্যে আমাদের অখ্যাতনামা কবি উপরের দৃষ্টান্তটিও নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এ দৃষ্টান্তে টাকার ক্ষমতা অপেক্ষা মানুষের মনের সেই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে যাহার প্রভাবে সে একই সময়ে একই লোককে যুগপৎ ভক্তি এবং অশ্রদ্ধা করিতে পারে।

সাধারণত গুরুপুরোহিত যে সাধুপুরুষ নহেন, সামান্য বৈষয়িকদের মতো পয়সার প্রতি তাঁহার যে বিলক্ষণ লোভ আছে সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র অন্ধতা নাই, তথাপি তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়া থাকি কেননা গুরু ব্রহ্ম। এরূপ ভক্তি দ্বারা আমরা নিজেকে অপমানিত করি, এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান করাই যে আত্মসম্মান এ কথা আমরা মনেই করি না।

কিন্তু অন্ধ ভক্তি অন্ধ মানুষের মতো অভ্যাসের পথ দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। সকল দেশেই ইহার নজির আছে। বিলাতে একজন লর্ডের ছেলে সর্বতোভাবে অপদার্থ হইলেও অতি সহজেই যোগ্য লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

যাহাকে অনেকদিন অনেকে পূজা করিয়া আসিতেছে তাহাকে ভক্তি করিবার জন্য কোনো ভক্তিজনক গুণ বা ক্ষমতাবিচারের প্রয়োজনই হয় না। এমন - কি, সে স্থলে অভক্তির প্রত্যক্ষ কারণ থাকিলেও তাহার পদমূলে অর্ঘ্য আপনি আসিয়া অকৃষ্ট হয়।

এইরূপ আমাদের মনের মধ্যে স্বভাবতই অনেকটা পরিমাণে জড়ধর্ম আছে। সেই কারণে আমাদের মন অভ্যাসের গড়ানো পথে মোহের আকর্ষণে আপনিই পাথরের মতো গড়াইয়া পড়ে, যুক্তি তাহার মাঝখানে বাধা দিতে আসিলে যুক্তি চূর্ণ হইয়া যায়।

সভ্যতার মধ্যে সেই জাগ্রত শক্তি আছে যাহা আমাদের মনের স্বাভাবিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করে ; যাহা আমাদিগকে কঠিন প্রমাণের পর বিশ্বাস করিতে বলে, যাহা আমাদিগকে শিক্ষিত রুচির দ্বারা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত করে, যাহা আমাদিগকে পরীক্ষিত যোগ্যতার নিকট ভক্তিনম্র হইতে উপদেশ দেয়, যাহা এইরূপে ক্রমশই আমাদের সচেষ্ট মনকে নিশ্চেষ্ট জড়বন্ধনের জাল হইতে উদ্ধার করিতে থাকে।

এই অশ্রান্ত সভ্যতাশক্তির উত্তেজনাতেই য়ুরোপখণ্ডে ভক্তিবৃত্তির জড়ত্বকে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করিতে না পারিলেও তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে। ইংরেজ একজন লর্ডকে সুদ্ধমাত্র লর্ড বলিয়াই বিশেষ ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না এবং সেইসঙ্গে এইরূপ অযোগ্য ভক্তিকে “স্নবিসনেস” বলিয়া লাঞ্ছিত করে। ক্রমশ ইহার ফল দুই দিকেই ফলে—অর্থাৎ আভিজাত্যের প্রতি সাধারণ লোকের অসংগত ভক্তি শিথিল হয় এবং অভিজাতগণও এই বরাদ্দ ভক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া কোনো নিন্দনীয় কাজ করিতে সাহস করেন না।

এই শক্তির বলে অন্ধ রাজভক্তির মোহপাশ ছেদন করিয়া য়ুরোপ কেমন করিয়া আপনি রাজা হইয়া উঠিতেছে তাহা কাহারো অগোচর নাই। পুরোহিতের

প্রতি অন্ধভক্তির বিরুদ্ধেও য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিদ্রোহী শক্তি কাজ করিতেছে।

জনসমাজে স্বাধীন ক্ষমতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি য়ুরোপে টাকার থলি একটা পূজার বেদী অধিকার করিবার উপক্রম করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যে তাহা সর্বদা উপহসিত। কার্লাইল প্রভৃতি নমস্বীগণই হার

বিরুদ্ধে রক্তধ্বজা আন্দোলন করিতেছেন।

যে ক্ষমতার কাছে মস্তক নত করিলে মস্তকের অপমান হয়, যেমন টাকা, পদবী, গায়ের জোর এবং অমূলক প্রথা—যাহাকে ভক্তি করিলে ভক্তি নিষ্ফলা হয়, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির প্রসার না ঘটিয়া কেবল সংকোচ ঘটে তাহার দুর্দান্ত শাসন হইতে মনকে স্বাধীন ও ভক্তিকে মুক্ত করা মনুষ্যত্ব রক্ষার প্রধান সাধনা।

ভক্তির দ্বারা যে - বিনতি আনয়ন করে সে - বিনতি সকল ক্ষেত্রেই শোভন নহে। এই বিনতি, কেবল গ্রহণ করিবার শিক্ষা করিবার, মাহাত্ম্যপ্রভাবের নিকট আপনার প্রকৃতিকে সাষ্টাঙ্গে অনুকূল করিবার জন্য। কিন্তু অমূলক বিনতি, অস্থানে বিনতি সেই কারণেই দুর্গতি আনয়ন করে। তাহা হীনকে ভক্তি করিয়া হীনতা লাভ করে, তাহা অযোগ্যের নিকট নত হইয়া অযোগ্যতার জন্য আপনাকে অনুকূল করিয়া রাখে।

ভক্তি আমাদিগকে ভক্তিভাজনের আদর্শের প্রতি স্বতঃ আকর্ষণ করে বলিয়াই সজীব সভ্যসমাজে কতকগুলি কঠিন বিচার প্রচলিত আছে। সেখানে যে - লোকের এমন কোনো ক্ষমতা আছে যাহা সাধারণের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাহাকে সমাজ সকল বিষয়েই নিষ্কলঙ্ক হইতে প্রত্যাশা করে। যে লোক রাজনীতিতে শ্রদ্ধেয় সেলোক ধর্মনীতিতে হেয় হইলে সাধারণ দুর্নীতিপর লোক অপেক্ষা তাহাকে অনেক বেশি নিন্দনীয় হইতে হয়।

এক হিসাবে ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ অন্যায় আছে। কারণ, ক্ষমতা সর্বতোব্যাপী হয় না, রাষ্ট্রনীতিতে যাহার বিচক্ষণতা, তাহার ক্ষমতা এবং চরিত্রের অপর অংশ সাধারণ লোকের অপেক্ষা যে উন্নত হইবেই এমন কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম নাই, অতএব সাধারণ লোককে যে - আদর্শে বিচার করি, রাষ্ট্রনীতিতে বিচক্ষণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনীতি ব্যতীত অন্য অংশে সেই আদর্শে বিচার করাই উচিত। কিন্তু সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য এ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অবিচার করিতে বাধ্য।

কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি ভক্তির দ্বারা মন গ্রহণ করিবার অনুকূল অবস্থায় উপনীত হয়। এক অংশ লইব এবং অপর অংশ লইব না এমন বিচক্ষণশক্তি তাহার থাকে না। কোনো সূত্রে যে - লোক আমার ভক্তি আকর্ষণ করে, অলক্ষে, নিজের অজ্ঞাতসারে আমি তাহার অনুকরণ করিতে থাকি। ভক্তির ধর্মই এই।
কিন্তু যে - বিষয়ে কোনো লোক অসাধারণ, ঠিক সেই বিষয়েই সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার অনুকরণ দুঃসাধ্য। সুতরাং যে - অংশে সে সাধারণ লোকের অপেক্ষা উচ্চ নহে, এমন - কি, যে - অংশে তাহার দুর্বলতা, সেই অংশেরই অনুকরণ দেখিতে দেখিতে ব্যাপ্ত এবং সফল হইয়া উঠে। এইজন্য যে - লোক এক বিষয়ে মহৎ সে - লোক অন্য বিষয়ে হীন হইলে সমাজ প্রথমত তাহার এক বিষয়ের মহত্ত্বও অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে, তাহাতে যদি কৃতকার্য না হয় তবে তাহার হীনতার প্রতি সাধারণ হীনতা অপেক্ষা গাঢ়তর কলঙ্ক আরোপ করে। আত্মরক্ষার জন্য সভ্যসমাজের এইরূপ চেষ্টা। যে লোক আসাধারণ, তাহাকে সংশোধন করিবার জন্য ততটা নহে, কিন্তু যাহারা সাধারণ লোক তাহাদিগকে ভক্তির কুফল হইতে রক্ষা করিবার জন্য।

অহংকারের কুফল সম্বন্ধে নীতিশাস্ত্রমাত্রেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া রাখে। অহংকারে লোকের পতন হয় কেন। প্রথম কারণ, নিজের বড়োত্ব সম্বন্ধে অতিবিশ্বাস থাকাতে সে পরকে ঠিকমত জানিতে পারে না ; যে - সংসারে পাঁচজনের সহিত বাস করিতে ও কাজ করিতে হয় সেখানে নিজের তুলনায় অন্যকে যথার্থরূপে জানিতে পারিলে তবেই সকল বিষয়ে সফলতা লাভ করা সম্ভব। চীনদেশ আত্মাভিমানের প্রবলতায় জাপানকে চিনিতে পারে নাই, তাই তাহার এমন অকস্মাৎ দুর্গতি ঘটিল। জার্মানির সহিত যুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্সেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। আর অতিদর্পে হতা লঙ্কা, এ কথা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে, জ্ঞানই বল। কী গৃহে কী কর্মক্ষেত্রে পরের সম্বন্ধে ঠিকমত জ্ঞানই আমাদের প্রধান বল। অহংকার সেই সম্বন্ধে অজ্ঞতা আনয়ন করিয়া আমাদের দুর্বলতার প্রধান কারণ হইয়া থাকে।

অহংকারের আর - এক বিপদ, তাহা সংসারকে আমাদের প্রতিকূলে দাঁড় করায়। যিনি যত বড়ো লোকই হোন - না কেন, সংসারের কাছে নানা বিষয়ে ঋণী ; যে - লোক সবিনয়ে সেই ঋণ স্বীকার করিতে না চাহে তাহার পক্ষে ঋণ পাওয়া কঠিন হয়।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিপদ আর - একটি আছে। বড়োকে বড়ো বলিয়া জানায় একটি আধ্যাত্মিক আনন্দ আছে। আত্মার বিস্তার হয় বলিয়া সে - আনন্দ। অহংকার আমাদিগকে নিজের সংকীর্ণতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে ; যাহার ভক্তি নাই, সে জানে না অহংকারের অধিকার কত সংকীর্ণ ; যাহার ভক্তি আছে সেই জানে আপনার বাহিরে যে - বৃহত্ত্ব যে - মহত্ত্ব তাহাই অনুভব করাতেই আত্মার মুক্তি।

এইজন্য বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উভয় হিসাবেই অহংকারের এত নিন্দা।

কিন্তু অযথা ভক্তিও যে অহংকারের মতো সর্বতোভাবে দূষ্য, নীতিশাস্ত্রে সে কথার উল্লেখ থাকা উচিত। অন্ধ ভক্তিও পরের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার কারণ হয়। এবং অযোগ্য ভক্তিতে আমাদিগকে যদি আপনার সমকক্ষ অথবা আপনার অপেক্ষা হীনের নিকট নত করে, তবে তাহাতে যে দীনতা উপস্থিত করে তাহা অহংকারের সংকীর্ণতা অপেক্ষা অল্প হেয় নহে।

এইজন্য ইংরেজসমাজে অভিমানকে অহংকারের মতো নিন্দনীয় বলে না। অভিমান না থাকিলে মনুষ্যত্বের হানি হয়, এ কথা তাহারা স্বীকার করে।

যাহার মনুষ্যত্বের অভিমান আছে, সে কখনোই অযোগ্য স্থানে আপনাকে নত করিতে পারে না। তাহার ভক্তিবৃত্তি যদি চরিতার্থ চায় তা তবে সে যেখানে - সেখানে লুটাইয়া পড়ে না—সে যথোচিত সন্ধান ও প্রমাণের দ্বারা যথার্থ ভক্তিভাজনকে বাহির করে।

কিন্তু আমরা ভক্তিপ্রবণ জাতি। ভক্তি করাকেই আমরা ধর্মাচরণ বলিয়া থাকি ; কাহাকে ভক্তি করি তাহা বিচার করা আমাদের পক্ষে বাহুল্য।

আমাদের সৎ - প্রবৃত্তিরও পথ যদি অত্যন্ত অবাধ হয়, তাহাতে ভালো ফল হয় না। তাহার বল, তাহার সচেষ্টতা, তাহার আধ্যাত্মিক উজ্জ্বলতা রক্ষার জন্য, তাহাকে অমোঘ হইবার জন্য, বাধার সহিত তাহার সংগ্রাম আবশ্যক।

যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ণয় করিতে হইলে তাহাকে পদে পদে সংশয়ের দ্বারা বাধা দিতে হয়, আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বসাধারণের কাছে যাহা অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া খ্যাত, তাহাকেও কঠিন প্রমাণের দ্বারা বারংবার বিচিত্রভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। যে লোক অতিব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি আপনার প্রশ্নের উত্তর পাইতে চায় তাহার উত্তর জানিবার ব্যাকুলতা সহজে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে ভুল উত্তর পায়। বৈজ্ঞানিকের ব্যাকুলতা সহজে নিবৃত্ত হইতে পায় না, কিন্তু বহু কষ্টে বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সে যে - উত্তরটুকু পায় তাহা খাঁটি। এখানে যে - কোনো প্রকারে হউক জিজ্ঞাসাবৃত্তির নিবৃত্তির মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে, সত্যনির্ণয়ই জিজ্ঞাসার পরিণাম।

তেমনি, তাড়াতাড়ি কোনো প্রকারে ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তির সাধনই ভক্তির সার্থকতা নহে, বরঞ্চ কোনোমতে আপনাকে পরিতৃপ্ত করিবার আগ্রহে সে আপনাকে ভ্রান্ত পথে লইয়া যায়। এইরূপে সে মিথ্যা দেবতা, আত্মাবমান ও সহজ সাধনার সৃষ্টি করিতে থাকে। মহত্ত্বের ধারণাই ভক্তির লক্ষ্য তা সে যতই কঠিন হউক ; আত্ম - পরিতৃপ্তি নহে, তা সে যতই সহজ ও সুখকর হউক।

জিজ্ঞাসাবৃত্তির পথে বুদ্ধিবিচারই প্রধান আবশ্যক বাধা। সেইসঙ্গে একটা অভিমানও আছে। অভিমান বলে, আমাকে ফাঁকি দিতে পারিবে না। আমি এমন অপদার্থ নহি। যাহা - তাহাকে আমি সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। আগে আমার সমস্ত সংশয় পরাস্ত করো, তবেই আমি সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

ভক্তিপথেও সেই বুদ্ধিবিচার ও অভিমানই অত্যাবশ্যক বাধা। সেই বাধা থাকিলে তবেই যথার্থ ভক্তিভাজনকে আশ্রয় করিয়া ভক্তি আপনাকে চরিতার্থ করে। অভিমান সহজে নাথা নত হইতে দেয় না। যখন সে আত্মসমর্পণ করে তখন ভক্তিভাজনের পরীক্ষা হইয়া গেছে, রামচন্দ্র তখন ধনুক ভাঙিয়া তবে তাঁহার বলের প্রমাণ দিয়াছেন। সেই বাধা না থাকিলে ভক্তি অলস হইয়া যায়, অন্ধ হইয়া যায়, কলের পুতুলের মতো নির্বিচারে ক্ষণে ক্ষণে মাথা নত করিয়া সে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। এইরূপে ভক্তি অধ্যাত্মশক্তি হইতে মোহে পরিণত হয়।

www.bengaliebook.com

অনেক সময় আমরা ভুল বুঝিয়া ভক্তি করি। যাহাকে মহৎ মনে করি সে হয়তো মহৎ নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কল্পনায় সে মহৎ, ততক্ষণ তাহাকে ভক্তি করিলে ক্ষতির কারণ অল্পই আছে।

ক্ষতির কারণ কিছু নাই তাহা নয়। পূর্বেই বলিয়াছি যাহাকে মহৎ বলিয়া ভক্তি করি, জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হই। যে - লোক প্রকৃত মহৎ নহে, কেবল আমাদের কল্পনায় ও বিশ্বাসে মহৎ, অন্ধভাবে তাহার আচরণের অনুকরণ আমাদের পক্ষে উন্নতিকর নহে।

কিন্তু আমাদের দেশে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা ভুল বুঝিয়াও ভক্তি করি। আমরা যাহাকে হীন বলিয়া জানি, তাহার পদধূলি অকৃত্রিম ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতে ব্যগ্র হই। ইহা অপেক্ষা আত্মাবমাননা কল্পনা করা যায় না।

সৈন্যগণকে যেমন মরিবার মুখে লইয়া যাইতে হইলে বহুদিনের কঠিন চর্চায় যন্ত্রবৎ বশ্যতা অভ্যাস করাইয়া লইতে হয় তেমনি পদে পদে আমাদের জাতিকে বিনাশের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্র আমাদের আচার আমাদিগকে বিশ্ব - জগতের কাছে নত এবং বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দেশে মোহান্তের মহৎ, পুরোহিতের পবিত্র এবং দেবচরিত্রের উন্নত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ আমরা ভক্তি লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছি। যে - মোহান্ত জেলে যাইবার যোগ্য তাহার চরণামৃত পান করিয়া আমরা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করি না, যে - পুরোহিতের চরিত্র বিশুদ্ধ নহে এবং যে - লোক পূজানুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির অর্থ পর্যন্তও জানে না তাহাকে ইষ্ট গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের মুহূর্তের জন্যও কুণ্ঠাবোধ হয় না, এবং আমাদেরই দেশে দেখা যায়, যে - সকল দেবতার পুরাণবর্ণিত আচরণ লক্ষ করিয়া আলাপে ও প্রচলিত কাব্যে ও গানে অনেক স্থলে নিন্দা ও পরিহাস করি, সেই দেবতাকেই আমরা পূর্ণ ভক্তিতে পূজা করিয়া থাকি।

সুতরাং এ স্থলে সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে, কেন পূজা করি। তাহার এক উত্তর এই যে, অভ্যাসবশত অর্থাৎ মনের জড়ত্ববশত ; দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ভক্তিজনক গুণের জন্য নহে, পরন্তু শক্তি কল্পনা করিয়া এবং সেই শক্তি হইতে ফল কামনা করিয়া।

আমাদের উদ্‌ধৃত শ্লোকের প্রথমেই আছে, “ ইষ্টি আর পুরোহিত যাহা হতে সর্বস্থিত। ” ইহাতেই বুঝা যাইতেছে গুরু ও পুরোহিতের মধ্যে আমরা একটা গূঢ় শক্তি কল্পনা করিয়া থাকি ; তাঁহাদের শিক্ষা, চরিত্র ও আচরণ যেমনই হউক তাঁহারা আমাদের সাংসারিক মঙ্গলের প্রধান কারণ এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তিতে লাভ ও অভক্তিতে লোকসান আছে, এই বিশ্বাস আমাদের মাথাকে তাঁহাদের পায়ের কাছে নত করিয়া রাখিয়াছে। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিশ্বাস এতদূর পর্যন্ত গিয়াছে যে, তাঁহারা গৃহধর্মনীতির সুস্পষ্ট ব্যভিচার দ্বারাও গুরুভক্তিকে অন্যায় প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

দেবতা সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। দেবচরিত্র আমাদের আদর্শ চরিত্র হইবে, এমন আবশ্যক নাই। দেবভক্তিতে ফল আছে, কারণ দেবতা শক্তিমান।

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও তাহাই। ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র নরাধাম হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়াই পূজ্য। ব্রাহ্মণের কতকগুলি নিগূঢ় শক্তি আছে। তাঁহাদের প্রসাদে ও বিরাগে আমাদের ভালো মন্দ ঘটিয়া থাকে। এরূপ ভক্তিতে ভক্ত ও ভক্তিপাত্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ থাকে না, দেনা - পাওনার সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া যায়। সেই সম্বন্ধে ভক্তিপাত্রকেও উচ্চ হইতে হয় না এবং ভক্তও নীচতা লাভ করে।

কিন্তু আমাদের দেবভক্তি সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত অনেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তর্ক করেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর যখন সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী তখন ঈশ্বর বলিয়া আমরা যাঁহাকেই পূজা করি, ঈশ্বরই সে - পূজা গ্রহণ করেন। অতএব এরূপ ভক্তি নিষ্ফল নহে।

পূজা যেন খাজনা দেওয়ার মতো ; স্বয়ং রাজার হস্তেই দিই আর তাঁহার তহসিলদারের হস্তেই দিই, একই রাজভাণ্ডারে গিয়া জমা হয়।

দেবতার সহিত দেনা - পাওনার সম্বন্ধ আমদের মনে এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, পূজার দ্বারা ঈশ্বরের যেন একটা বিশেষ উপকার করিলাম এবং তাহার পরিবর্তে একটা প্রত্যুৎপকার আমার পাওনা রহিল, ইহাই ভুলিতে না পারিয়া আমরা দেবভক্তি সম্বন্ধে এমন দোকানদারির কথা বলিয়া থাকি। পূজাটা দেবতার হস্তগত হওয়াই যখন বিষয়, এবং সেটা ঠিকমত তাঁহার ঠিকানায় পৌঁছিলেই যখন আমার কিঞ্চিৎ লাভ আছে, তখন যত অল্প ব্যয়ে অল্প চেষ্টায় সেটা চালান করা যায় ধর্ম - ব্যবসায়ে ততই আমার জিত। দরকার কী ঈশ্বরের স্বরূপ ধারণার

চেষ্টায়, দরকার কী কঠোর সত্যানুসন্ধানে; সম্মুখ কাষ্ঠ প্রস্তর যাহা উপস্থিত থাকে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা নিবেদন করিয়া দিলে যাঁহার পূজা তিনি আপনি ব্যগ্র হইয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া লইবেন।

আমাদের পূরাণে ও প্রচলিত কাব্যে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে মনে হয় যেন দেবতারা আপনাদের পূজা গ্রহণের জন্য মৃতদেহের উপর শকুনি - গৃধিনীর ন্যায় কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছেন। অতএব আমাদের নিকট হইতে ভক্তিগ্রহণের লোলুপতা যে ঈশ্বরেরই, এ কথা আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনেও অলক্ষে বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু কী মনুষ্যপূজায় এবং কী দেবপূজায়, ভক্তি ভক্তেরই লাভ। যাঁহাকে ভক্তি করি তিনি না জানিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহাকে আমার জানা চাই, তবেই আমার ভক্তির সার্থকতা। পূজ্য ব্যক্তির আদর্শকে আমাদের প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ মিশাইয়া লইতে চাহিলে ভক্তি ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। আমরা যাঁহাকে পূজা করি তাঁহাকেই যদি বস্তুত চাই তবে তাঁহার প্রকৃতির আদর্শ তাঁহার সত্যস্বরূপ একান্ত ভক্তিযোগে হৃদয়ে স্থাপনা করিতে হয়। সেরূপ অবস্থায় ফাঁকি দিতে স্বতই প্রবৃত্তি হয় না ; তাঁহার সহিত বৈসাদৃশ্য ও দূরত্ব যতই দীনত্বের সহিত অনুভব করি, ততই ভক্তি বাড়িয়া উঠিয়া ক্ষুদ্র আপনাকে তাঁহার সহিত লীন করিবার চেষ্টা করে।

ইহাই ভক্তির গৌরব। ভক্তিরস সেই আধ্যাত্মিক রসায়নশক্তি যাহা ক্ষুদ্রকে বিগলিত করিয়া মহতের সহিত মিশ্রিত করিতে পারে।

অতএব ঈশ্বরকে যখন ভক্তি করি তখন তদ্বারা তাঁহার ঐশ্বর্য বাড়ে না,. আমরাই সেই রসস্বরূপের রাসায়নিক মিলন লাভ করি। আমাদের ঈশ্বরের আদর্শ যত মহৎ মিলনের আনন্দ ততই প্রগাঢ়, এবং তদ্বারা আত্মার প্রসার ততই বিপুল হইবে।

ভক্তি আমরা যাঁহাকে করি, তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পাই না। যদি গুরুকে ব্রহ্ম বলিয়া ভক্তি করি, তবে সে গুরুর আদর্শই আমাদের মনে অঙ্কিত হয়। ভক্তির প্রবলতায় সেই গুরুর মানস আদর্শ তাঁহার স্বাভাবিক আদর্শ অপেক্ষা কতকটা পরিমাণে আপনি বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না।

অস্থানে ভক্তি করিবার একটা মহৎ পাপ এই যে, যিনি যথার্থ পূজ্য, অযোগ্য পাত্রদের সহিত তাঁহাকে একাসনভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। দেবতায় উপদেবতায় প্রভেদ থাকে না।

আমাদের দেশে এই অন্যায় মিশ্রণ সকল দিকেই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশে অনাচার এবং পাপ এক কোঠায় পড়িয়া গেছে। ইতর জাতিকে স্পর্শ করাও পাপ, ইতর জাতিকে হত্যা করাও পাপ। নরহত্যা করিয়া সমাজে নিষ্কৃতি আছে কিন্তু গোহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি নাই। অন্যায় করিয়া যবনের অন্ন মারিলে ক্ষমা আছে কিন্তু তাহার অন্ন গ্রহণ করিলে পাতক।

প্রায়শ্চিত্ত - বিধিও তেমনি। তিলক রাজদ্রোহ অভিযোগে জেলে গিয়াছেন–সেখানে অনিবার্য রাজদণ্ডের বিধানে তাঁহাকে দূষিত অন্ন গ্রহণ করিতে হইয়াছে ; মাথা মুড়াইয়া গোঁফ কামাইয়া কঠিন প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য সমাজ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তিলক যে সত্য রাজদ্রোহী এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না এবং যদি - বা করিত সেজন্য তাঁহাকে দণ্ডনীয় করিত না–কিন্তু যে অনিচ্ছাকৃত অনাচারে তাঁহার সাধু চরিত্রকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে নাই তাহাই তাঁহার পক্ষে পাপ, এবং সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত মস্তকমুণ্ডন।

যে - সমস্ত পাপ অনাচার মাত্র নহে–যাহা মিথ্যাচরণ, চৌর্য, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি চরিত্রের মূলগত পাপ তাহারও খণ্ডন তিথিবিশেষে গঙ্গাস্নানে তীর্থযাত্রায়।

অনাচার আচারের ত্রুটি এবং ধর্মনিয়মের লঙ্ঘনকে একত্র মিশ্রিত করিয়া আমরা এমনই একটি ঘোরতর জড়বাদ, এমনই নিগূঢ় নাস্তিকতায় উপনীত হইয়াছি।

ভক্তিরাজ্যেও সেইরূপ মিশ্রণ ঘটাইয়া আমরা ভক্তির আধ্যাত্মিকতা নষ্ট করিয়াছি। সেইজন্যই আমরা বরঞ্চ সাধু শূদ্রকে ভক্তি করি না, কিন্তু অসাধু ব্রাহ্মণকে ভক্তি করি। আমরা প্রভাতসূর্যালোকিত হিমাদ্রিশিখরের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া যাইতে পারি কিন্তু সিন্দুরলিপ্ত উপলখণ্ডকে উপেক্ষা করিতে পারি না।

সত্য এবং শাস্ত্রের মধ্যেও আমরা এইরূপ একটা জটা পাকাইয়াছি। সমুদ্রযাত্রা উচিত কি না তাহা নির্ণয় করিতে ইহাই দেখা কর্তব্য যে, নূতন দেশ ও নূতন আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের জ্ঞানের বিস্তার হয় কি না, আমাদের সংকীর্ণতা দূর হয়

কি না, ভূখণ্ডের একটি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কোনো জ্ঞানপিপাসু উন্নতি - ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বলপুর্বক বদ্ধ করিয়া রাখিবার ন্যায্য অধিকার কাহারো আছে কি না। কিন্তু তাহা না দেখিয়া আমরা দেখিব, পরাশর সমুদ্র পার হইতে বলিয়াছেন কি না এবং অত্রি কী বলিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

বালবিধবাকে চিরকুমারী করিয়া রাখা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিদারুণ ও সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক কি না ইহা আমাদের দ্রষ্টব্য বিষয় নহে কিন্তু বহু প্রাচীনকালে সমাজের শিক্ষা আচার ও অবস্থার একান্ত পার্থক্যের সময় কোন্ বিধানকর্তা কী বলিয়াছেন তাহাই আলোচ্য।

এমন বিপরীত বিকৃতি কেন ঘটিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, স্বাধীনতাতেই যে - সমস্ত প্রবৃত্তির প্রধান গৌরব তাহাদিগকেই বন্ধনে বদ্ধ করা হইয়াছে।

অভ্যাস বা পরের নির্দেশবশত নহে, পরন্তু স্বাধীন বোধশক্তি যোগে ভক্তিবলে আমরা মহত্ত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করি, তাহাই সার্থক ভক্তি।

কিন্তু আশঙ্কা এই যে, যদি বোধশক্তি তোমার না থাকে। অতএব নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া গেল, অমুক সম্প্রদায়কে এই প্রণালীতে ভক্তি করিতেই হইবে। না করিলে সাংসারিক ক্ষতি ও পুরুষানুক্রমে নরকবাস।

যে - ভক্তি স্বাধীন হৃদয়ের তাহাকে মৃত শাস্ত্রে রাখা হইল ; যে - ভক্তির প্রকৃত লাভ - ক্ষতি আমাদের অন্তঃকরণে আমাদের অন্তরাত্মায় তাহা সংসারের খাতায় ও চিত্রগুপ্তের কাল্পনিক খতিয়ানে লিখিত হইল।

গাছ মাটিতে রোপণ করিলে তাহাকে গোরুতে খাইতে পারে, তাহাকে পথিকে দলন করিতে পারে, এই ভয়ে তাহাকে লোহার সিন্দুকে বন্ধ রাখা হইল। সেখানে সে নিরাপদে রহিল, কিন্তু তাহাতে ফল ধরিল না ; সজীব গাছ মৃত কাষ্ঠ হইয়া গেল।

মানুষের বুদ্ধিকে যতক্ষণ স্বাধীনতা না দেওয়া যায় ততক্ষণ সে ব্যর্থ কিন্তু যদি সে ভুল করে, অতএব তাহাকে বাঁধো ; আমি বুদ্ধিমান যে - ঘানিগাছ রোপণ করিলাম চোখে ঠুলি দিয়া সেইটেকে সে নিত্যকাল প্রদক্ষিণ করিতে থাক্। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাকে কোনোদিন মাথা ঘুরাইতে হইবে না—আমি ঠিক করিয়া দিলাম কোন্ তিথিতে মূলা খাইলে তাহার নরক এবং চিঁড়া খাইলে তাহার অক্ষয় ফল। তোমার মূলা ছাড়িয়া চিঁড়া খাইয়া তাহার কী উপকার হইল তাহার কোনো প্রমাণ

নাই, কিন্তু যাহা অপকার হইল ইতিহাসে তাহা উত্তরোত্তর পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

একটি সামান্য উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে যাহারা রেশম কীটের চাষ করে তাহাদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, নিরামিষ আহার, নিয়ম পালন ও গঙ্গাজল প্রভৃতি দ্বারা নিজেকে সর্বদা পবিত্র না রাখিলে রেশমব্যবসায়ীর সাংসারিক অমঙ্গল ঘটে।

শিক্ষিত ব্যক্তিরা বলিয়া উঠিবেন, পাছে মলিনতা দ্বারা রেশমকীটের মধ্যে সংক্রামক রোগবীজ প্রবেশ করিয়া ফসল নষ্ট হয় এইজন্য বুদ্ধিমান কর্তৃক এইরূপ প্রবাদ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু চাষাকে প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝাইয়া দিয়া তাহার বুদ্ধিকে চিরকালের মতো অন্ধ করিয়া পরিণামে বিষময় ফল হয়। চাষা অনির্দিষ্ট অমঙ্গল আশঙ্কায় নিজে নিয়ম পালন করে কিন্তু কীটদের সম্বন্ধে নিয়ম রক্ষা করে না– স্নানপানাদির দ্বারা নিজে পবিত্র থাকে কিন্তু কীটের ঘরে এক পাতায় তিন দিন চলিতেছে, মলিনতা সঞ্চিত হইতেছে তাহাতে দৃষ্টি নাই।

শোয়া বসা চলা ফিরা কোনো ক্ষুদ্র বিষয়েই যাহাকে স্বাধীন বুদ্ধি চালনা ও নিজের শুভাশুভ বিচার করিতে হয় না তাহার কাছে অদ্য বৈজ্ঞানিক সত্য বুঝাইতে গিয়া মাথায় করাঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

এইরূপে নীতি, ভক্তি ও বুদ্ধি–স্বাধীনতাতেই যাহার বল, যাহার জীবন, স্বাধীনতাতেই যাহার যথার্থ স্বরূপ রক্ষিত ও বিকশিত হয়, তাহাদিগকে সর্বপ্রকার স্বাভাবিক আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সযত্নে মৃত্যু ও বিকৃতির মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহাতে আমাদের মানসিক প্রকৃতির এমনই নিদারুণ জড়ত্ব জন্মিয়াছে যে, যাহাকে আমরা জ্ঞানে জানি ভক্তির অযোগ্য তাহাকেও প্রথার অভ্যাসে ভক্তি করিতে সংকোচমাত্র অনুভব করি না।

পূর্ব ও পশ্চিম

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস।

একদিন যে শ্বেতকায় আর্যগণ প্রকৃতির এবং মানুষের সমস্ত দুরূহ বাধা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে অন্ধকারময় সুবিস্তীর্ণ অরণ্য এই বৃহৎ দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত ছিল তাহাকে একটা নিবিড় যবনিকার মতো সরাইয়া দিয়া ফলশস্যে - বিচিত্র আলোকময় উন্মুক্ত রঙ্গভূমি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি শক্তি ও সাধনা একদিন এই ইতিহাসের ভিত্তিরচনা করিয়াছিল। কিন্তু, এ কথা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষ আমাদেরই ভারতবর্ষ।

আর্যরা অনার্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম যুগে আর্যদের প্রভাব যখন অক্ষুণ্ন ছিল, তখনো অনার্য শূদ্রদের সহিত তাঁহাদের প্রতিলোম বিবাহ চলিতেছিল। তার পর বৌদ্ধযুগে এই মিশ্রণ আরো অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের অবসানে যখন হিন্দুসমাজ আপনার বেড়াগুলি পুনঃসংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং খুব শক্ত পাথর দিয়া আপন প্রাচীর পাকা করিয়া গাঁথিতে চাহিল, তখন দেশের অনেক স্থলে এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ক্রিয়াকর্ম পালন করিবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল; অনেক স্থলে ভিন্নদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইয়াছে, এবং অনেকস্থলে রাজাজ্ঞায় উপবীত পরাইয়া ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইয়াছে, এ কথা প্রসিদ্ধ। বর্ণের যে - শুভ্রতা লইয়া একদিন আর্যরা গৌরব বোধ করিয়াছিলেন সে - শুভ্রতা মলিন হইয়াছে; এবং আর্যগণ শূদ্রদের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের বিবিধ আচার ও ধর্ম, দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সমাজের অন্তর্গত করিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া এক সমাজ রচিত হইয়াছে; বৈদিক সমাজের সহিত কেবল যে তাহার ঐক্য নাই তাহা নহে অনেক বিরোধও আছে।

অতীতের সেই পর্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে। বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিতে দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর

ইতিহাস। হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এ দেশে প্রবেশ করিল, চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।

যদি এইখানেই ছেদ দিয়া বলি, বাস্‌, আর নয়—ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা হিন্দু - মুসলমানেরই ইতিহাস করিয়া তুলিব, তবে, যে - বিশ্বকর্মা মানবসমাজকে সংকীর্ণ কেন্দ্র হইতে ক্রমশই বৃহৎ পরিধির দিকে গড়িয়া তুলিতেছেন, তিনি কি তাঁহার প্ল্যান বদলাইয়া আমাদেরই অহংকারকে সার্থক করিয়া তুলিবেন।

ভারতবর্ষ আমার হইবে কি তোমার হইবে, হিন্দুর হইবে কি মুসলমানের হইবে, কি আর কোনো জাত আসিয়া এখানে আধিপত্য করিবে, বিধাতার দরবারে যে সেই কথাটাই সব চেয়ে বড়ো করিয়া আলোচিত হইতেছে, তাহা নহে। তাঁহার আদালতে নানা পক্ষের উকিল নানা পক্ষের দরখাস্ত লইয়া লড়াই করিতেছে, অবশেষে একদিন মকদ্দমা শেষ হইলে পর হয় হিন্দু নয় মুসলমান নয় ইংরেজ নয় আর - কোনো জাতি চূড়ান্ত ডিক্রি পাইয়া নিশান - গাড়ি করিয়া বসিবে, এ কথা সত্য নহে। আমরা মনে করি জগতে স্বত্বের লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহংকার; লড়াই যা সে সত্যের লড়াই।

যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহা সকলকে লইয়া; এবং তাহাই নানা আঘাত - সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে—আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকেই আমরা যে - পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিব, সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে; নিজেকেই—ব্যক্তি হিসাবেই হউক আর জাতি হিসাবেই হউক—জয়ী করিবার যে চেষ্টা, বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। গ্রীসের জয়পতাকা আলেকজাণ্ডারকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে যে একচ্ছত্র করিতে পারে নাই, তাহাতে গ্রীসের দম্ভই অকৃতার্থ হইয়াছে; পৃথিবীতে আজ সে দম্ভের মূল্য কী। রোমের বিশ্বসাম্রাজ্যের আয়োজন বর্বরের সংঘাতে ফাটিয়া খান্‌খান্‌ হইয়া সমস্ত

www.bengaliebook.com

য়ুরোপময় যে বিকীর্ণ হইল, তাহাতে রোমকের অহংকার অসম্পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু সেই ক্ষতি লইয়া জগতে আজ কে বিলাপ করিবে। গ্রীস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেরাও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই, তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব করিয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।

ভারতবর্ষেও যে - ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এ - ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এ দেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে–ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে, আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, আমরা স্বতন্ত্র থাকিব, তবে সকল হিসাবেই ব্যর্থ হয়। বিরাট রচনার সহিত যে - খণ্ড সামগ্রী কোনোমতেই মিশ খাইবে না, যে বলিবে আমিই টিঁকিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। যে বলিবে আমি স্বয়ং কিছুই নই, যে - সমগ্র রচিত হইতেছে তাহারই উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট, ক্ষুদ্রকে সে - ই ত্যাগ করিয়া বৃহতের মধ্যে রক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষেরও যে - অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যাহা কোনো - একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য - সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারি দিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত - ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন, নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জন করিবেন। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত; আমরা নিজেকে যদি তাহার

www.bengaliebook.com

যোগ্য না করি, তবে আমরাই নষ্ট হইব। আমরা সর্বপ্রকারে সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে স্বতন্ত্র থাকিব, এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে করি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিরন্তন করিয়া রাখিবার ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষভাবে আমাদেরই, আমাদের পূজাক্ষেত্রে আর - কেহ পদার্পণ করিবে না, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে, তবে না জানিয়া আমরা এই কথাই বলি যে, বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া আছে–এক্ষণে তাহারই জন্য আত্মরচিত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।

সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর - একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্বেই করা হইয়া গেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা তো পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না। যাহারা প্রপিতামহদের মধ্যেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস এবং আচারের দ্বারা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন্ বর্তমানের তাড়নায়, কোন্ ভবিষ্যতের আশ্বাসে। পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে, সে - প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে, তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা পরিবর্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্‌ভাবনে, নানা প্রবর্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে; আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মতো জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে - পর্যন্ত না সফল হইবে, জগতযজ্ঞের নিমন্ত্রণে

তাহাদের সঙ্গে যে - পর্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে - পর্যন্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।
ইংরেজের আহ্বান যে - পর্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, তাহাদের সঙ্গে মিলন যে - পর্যন্ত না সার্থক হইবে, সে - পর্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্বক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে - ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ—আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কী অধিকার আছে। বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে। এ কি আমাদের ভারতবর্ষ। সেই আমরা কাহারা। সে কি বাঙালি, না মারাঠি, না পাঞ্জাবি, হিন্দু না মুসলমান? একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড আমরা ' র মধ্যে যে - কেহই মিলিত হইক, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অথবা আরো কেহ আসিয়াই এক হউক না, তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না, এ কথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে, পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের

ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন; আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন; আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে; পৃথিবীর যে - দেশেই যে - কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস কোনো ক্ষুদ্র অহংকারবশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই; যে - অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে রানাডে পূব - পশ্চিমের সেতুবন্ধনকার্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি সেই মিলনতত্ত্ব রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল; সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহারবিরোধ ও স্বার্থসংঘাত সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সাময়িক ক্ষোভ ক্ষুদ্রতার ঊর্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন। ভারত - ইতিহাসের যে - উপকরণ ইংরেজের মধ্যে আছে, তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, যাহাতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণতাসাধনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টায় চিরদিন প্রবৃত্ত ছিল।

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে - মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি

www.bengaliebook.com

ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।
একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব - পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল; সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এ - সাহিত্য সেই - সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে পূব - পশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলাসাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এমনি করিয়া আমরা যে দিক হইতে দেখিব, দেখিতে পাইব আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।

শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানাজাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিকাল বল লাভ করা। এমন করিয়া যে - জিনিসটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটোর দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব, ইহা অন্য সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ন হইতেছে, সুতরাং সর্বপ্রকার শক্তিই

ক্ষীণ হইয়া সর্বত্রই বাধা পাইতেছে; ইহা আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হইতছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।

সেই ধর্মবুদ্ধি হইতে এই মিলনচেষ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে। কিন্তু ধর্মবুদ্ধি তো কোনো ক্ষুদ্র অহংকার বা প্রয়োজনের মধ্যে বদ্ধ নহে। সেই বুদ্ধির অনুগত হইলে আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ হইবে তাহা নহে, এই চেষ্টা ইংরেজকেও ভারতবর্ষের করিয়া লইবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত হইবে।

সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষিত, এমন - কি অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যে বিরোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে আমরা কী ভাবে গ্রহণ করিব। তাহার মধ্যে কি কোনো সত্য নাই। কেবল তাহা কয়েকজন চক্রান্তকারীর ইন্দ্রজাল মাত্র? ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানা জাতি ও নানা শক্তির সমাগম হইয়াছে, ইহাদের সংঘাতে সম্মিলনে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে বর্তমান বিরোধের আবর্ত কি একেবারেই তাহার প্রতিকূল। এই বিরোধের তাৎপর্য কী তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বে বিরোধকেও মিলনসাধনার একটা অঙ্গ বলা হয়। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, রাবণ ভগবানের শত্রুতা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না। এইজন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে।

আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল; এমন করিয়া যথার্থভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বলো আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বলো, তাহা উপার্জনের অপেক্ষা রাখে, অর্থাৎ বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহার উপলব্ধি ঘটে; কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না। যে - ভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয়, সে - ভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে।

এইজন্যই কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। একটা আত্মাভিমান জন্মিয়া আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া নিজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

যে - মহাকালের অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়াই এই আত্মাভিমানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আমরা নির্বিচারে নির্বিরোধে দুর্বলভাবে দীনভাবে যাহা লইতেছিলাম, তাহা যাচাই করিয়া তাহার মূল্য বুঝিয়া তাহাকে আপন করিতে পারিতেছিলাম না, তাহা বাহিরের জিনিস পোশাকী জিনিস হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা পশ্চাদ্‌বর্তনের তাড়না আসিয়াছে।

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই; তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না, এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই। যে - শক্তি নব্যভারতের আদি - অধিনায়কের প্রকৃতির মধ্যে সহজেই ছিল, আমাদের মধ্যে তাহা নানা ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণে সেই চেষ্টা পর্যায়ক্রমে বিপরীত সীমার চূড়ান্তে গিয়া ঠেকিতেছে। একান্ত অভিমুখতা এবং একান্ত বিমুখতায় আমাদের গতিকে আঘাত করিতে করিতে আমাদিগকে লক্ষ্যপথে লইয়া চলিয়াছে।

বর্তমানে ইংরেজ - ভারতবাসীর যে - বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার একটা কারণ এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব; ইংরেজের জ্ঞান ও শক্তিকে ক্রমাগত নিশ্চেষ্টভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই পীড়ার মাত্রা অলক্ষিতভাবে জমিতে জমিতে আজ হঠাৎ দেশের অন্তঃকরণ প্রবলবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

www.bengaliebook.com

কিন্তু কারণ শুধু এই একটিমাত্র নহে। ভারতবর্ষের গৃহের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তাহাকে কোনোমতেই ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে পারিব না, তাহাকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের তরফে সেই আপন করিয়া লইবার আত্মশক্তির যদি অভাব ঘটে, তবে তাহাতে কালের অভিপ্রায়বেগ ব্যাঘাত পাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করিবে। আবার অন্যপক্ষেও পশ্চিম যদি নিজেকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে, তবে তাহাতেও বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহার সহিত আমাদের যদি সংস্রব না ঘটে, ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানত আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি, যে - ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয়ভাবে মিশিয়া পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সে - ক্ষেত্রে যদি তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি, তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিবই। এরূপ স্থলে প্রবল পক্ষ সিডিশনের আইন করিয়া দুর্বল পক্ষের অসন্তোষকে লোহার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অসন্তোষকে বাঁধিয়াই রাখা হইবে, তাহাকে দূর করা হইবে না। অথচ এই অসন্তোষ কেবল এক পক্ষের নহে। ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজের কোনোই আনন্দ নাই। ভারতবাসীর অস্তিত্বকে ইংরেজ ক্লেশকর বলিয়া সর্বতোভাবে পরিহার করিবারই চেষ্টা করে। একদা ডেভিড হেয়ারের মতো মাহাত্মা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ইংরেজচরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন; তখনকার ছাত্রগণ সত্যই ইংরেজজাতির নিকট হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। এখন ইংরেজ অধ্যাপক স্বজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল যে আমাদের নিকটে আনিয়া দিতে পারেন না তাহা নহে, তাঁহারা ইংরেজের আদর্শকে আমাদের কাছে খর্ব করিয়া ইংরেজের দিক হইতে বাল্যকাল হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া দেন। তাহার ফল এই হইয়াছে, পূর্বকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্যে ইংরেজের শিক্ষা যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্ররা তাহা করে না। তাহারা গ্রাস করে, তাহারা ভোগ করে না। সেকালের ছাত্রগণ যেরূপ আন্তরিক অনুরাগের সহিত শেক্‌স্‌পীয়র বায়রনের কাব্যরসে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ

জাতির সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটিতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে। অধ্যাপক বলো, ম্যাজিস্ট্রেট বলো, সদাগর বলো, পুলিসের কর্তা বলো, সকল প্রকার সম্পর্কেই ইংরেজ তাহার ইংরেজি সভ্যতার চরম অভি্যবক্তির পরিচয় অবাধে আমাদের নিকট স্থাপিত করিতেছে না–সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ - আগমনের যে - সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ, তাহা হইতে ইংরেজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে; আমাদের আত্মশক্তিকে বাধাগ্রস্ত এবং আত্মসম্মানকে খর্ব করিতেছে। সুশাসন এবং ভালো আইনই যে মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লাভ তাহা নহে। আপিস আদালত আইন এবং শাসন তো মানুষ নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়–তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দুঃখ অনেক অভাব সহিতেও সে রাজী আছে। মানুষের পরিবর্তে বিচার এবং আইন, রুটির পরিবর্তে পাথরেরই মতো। সে - পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।

এইরূপে পূর্ব ও পশ্চিমের সম্যক মিলনের বাধা ঘটিতেছে বলিয়াই আজ যত - কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে। কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং অনিষ্টকর। সুতরাং একদিন - না - একদিন ইহার প্রতিকারের চেষ্টা দুর্দম হইয়া উঠিবেই। এ বিদ্রোহ নাকি হৃদয়ের বিদ্রোহ, সেইজন্য ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আত্মহত্যা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হয়।

তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য যে, এ - সকল বিদ্রোহ ক্ষণিক। কারণ পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্যভাবেই মিলিতে হইবে, এবং তাহার যাহা - কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত ফল পরিণত হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণ তাহাকে বোঁটায় বাঁধা থাকিতে হইবেই, এবং বোঁটায় বাঁধা না থাকিলেও তাহার পরিণতি হইবে না।

এইবার একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরেজের যাহা - কিছু শ্রেষ্ঠ,, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সেজন্য আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্য ঘুচাইলে তবেই তাহাদেরও কৃপণতা ঘুচিবে। বাইবেলে লিখিত আছে, যাহার আছে, তাহাকেই দেওয়া হইবে।

সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে; তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে। যতদিন তাহারা আমাদিগকে

অবজ্ঞা করিবে, ততদিন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন হইতে পারিবে না। আমরা রিক্ত হস্তে তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইলে বার বার ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড়ো এবং সকলের চেয়ে ভালো তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভালো হয়, তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভালো হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্‌বোধিত করিয়া লইব। ইহা ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করিবার আর কোনো সহজ পন্থা নাই। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ইংরেজের কাছেও কঠিন দুঃখেই উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা দারুণ মন্থনে মথিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ সাক্ষাৎলাভ যদি করিতে চাই তবে আমাদের মধ্যেও শক্তির আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চাকরির লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যপক্ষে যাহারা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে চায়, তাহারা ইংরেজের পাপপ্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে, ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে, ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ যদি সত্য হয় তবে এজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বদেশে ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্ত্বকেই উদ্দীপিত রাখিবার জন্য চারি দিক হইতে নানা চেষ্টা নিয়ত প্রয়োগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা উচ্চ ভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য অশ্রান্তভাবে কাজ করে; এমনি করিয়া মোটের উপর নিজের নিকট হইতে যত দূর পর্যন্ত পূর্ণফল পাওয়া সম্ভব, ইংরেজ - সমাজ তাহা জাগিয়া থাকিয়া বলের সহিত আদায় করিয়া লইতেছে।

এ দেশে ইংরেজের প্রতি ইংরেজ - সমাজের সেই শক্তি সম্পূর্ণ বলে কাজ করিতে পারে না। এখানে ইংরেজ সমগ্র মানুষের ভাবে কোনো সমাজের সহিত যুক্ত নাই। এখানকার ইংরেজ - সমাজ হয় সিভিলিয়ান - সমাজ, নয় বণিক -

সমাজ, নয় সৈনিক - সমাজ। তাহারা তাহাদের বিশেষ কার্যক্ষেত্রে সংকীর্ণতার দ্বারা আবদ্ধ। এই - সকল ক্ষেত্রের সংস্কারসকল সর্বদাই তাহাদের চারি দিকে কঠিন আবরণ রচনা করিতেছে, বৃহৎ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শে সেই আবরণ ক্ষয় করিয়া ফেলিবার জন্য কোনো শক্তি তাহাদের চারি দিকে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে না। তাহারা এ দেশের হাওয়ায় কেবল কড়া সিভিলিয়ান, পুরা সদাগর এবং ষোলো - আনা সৈনিক হইয়া পাকিয়া উঠিতে থাকে; এই কারণেই ইহাদের সংস্রবকে আমরা মানুষের সংস্রব বলিয়া অনুভব করিতে পারি না। এইজন্যই যখন কোনো সিভিলিয়ান হাইকোর্টের জজের আসনে বসে তখন আমরা হতাশ হই; কারণ তখন আমরা জানি এ লোকটির কাছ হইতে যথার্থ বিচারকের বিচার পাইব না, সিভিলিয়ানের বিচারই পাইব; সেবিচারের ন্যায়ধর্মের সঙ্গে যেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মের বিরোধ ঘটিবে সেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মই জয়ী হইবে। এই ধর্ম ইংরেজের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষেরও প্রতিকূল।

আবার যে - ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কারবার, সেইভারতবর্ষের সমাজও নিজের দুর্গতি - দুর্বলতাবশতই ইংরেজের ইংরেজত্বকে উদ্‌বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না; সেইজন্য যথার্থ ইংরেজ এ দেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে - ফল পাইত সেই ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। সেইজন্যই পশ্চিমের বণিক সৈনিক এবং আপিস আদালতের বড়ো সাহেবদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে পূর্বের মানুষের মিলন ঘটিল না। পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এ দেশে যাহা - কিছু বিপ্লব বিরোধ, আমাদের যাহা - কিছু দুঃখ অপমান; এবং এই যে প্রকাশ পাইতেছে না, এমন - কি, প্রকাশ বিকৃত হইয়া যাইতেছে, সেজন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”—পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না; কোনো মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে; যে - ব্যক্তি দেবতাকে চায়, তাহার প্রকৃতিতে দেবতার গুণ থাকা আবশ্যক।

শক্ত কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বল প্রকাশ হয় না। ত্যাগের দ্বারাই বলের পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ

ইংরেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে, এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সমস্ত সামর্থ্যপ্রয়োগ করিয়া দেশের সর্বপ্রকার অভাবমোচন ও উন্নতিসাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতেই হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তাবশত নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবল পক্ষ দুর্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সদ্‌ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া, দাবি করিতে পারিব না; ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্‌বোধিত করিতে পারিব না, এবং ভারতবর্ষ কেবলই বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে। ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে ধর্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে; নিজের আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্‌বোধিত করিতেছে না, এইজন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না। এইজন্যই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে না, সে - মিলনে পূর্ণ ফল জন্মিতেছে না, সে - মিলনে আমরা অপমান এবং পীড়াই ভোগ করিতেছি। ইংরেজকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না; ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টার যোগসাধন হইবে; তখন বর্তমানে ভারত - ইতিহাসের যে পর্বটা

চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে, এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।